
সৈকত মুখোপাধ্যায়
নাটবাড়ি নার্সারি
ধ্বংস পরবর্তী পৃথিবীর দুটি কল্পকাহিনী

না টা বা ড়ি না র্সা রি

(ধ্বংস পরবর্তী পৃথিবীর দুটি কল্পকাহিনী)

নাটাবাড়ি নার্সারি

(ধ্বংস পরবর্তী পৃথিবীর দুটি কল্পকাহিনী)

সৈকত মুখোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন

২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৬

দীপ

NATABARI NURSERY
by Saikat Mukherjee

Phone 033-2241-2538 ♦ 98310 52249
website www.deepprakashan.com
email deepprakashan@gmail.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

প্রকাশক শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০১৫

উৎসর্গ

অগ্রজ সাহিত্যিক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীজয়ন্ত দের করকমলে।

ভূমিকা

এই সংকলনের মধ্যে যে-দুটি উপন্যাস সংকলিত হয়েছে; নাটাবাড়ি নার্সারি এবং না-পুরুষের পৃথিবী; সেই দুটি উপন্যাসই চরিত্রে 'পোস্ট- অ্যাপোক্যালিপটিক'। অর্থাৎ ভবিষ্যতের ধ্বংস পরবর্তী পৃথিবীই তাদের পটভূমি।

নাটাবাড়ি নার্সারিতে সেই ধ্বংস এসেছিল প্রকৃতির খামখেয়ালে; পৃথিবীর অক্ষরেখার সামান্য হেরফেরে বায়ুমণ্ডল হয়ে উঠেছিল অগ্নিগর্ভ। আর না-পুরুষের পৃথিবীতে ধ্বংস সাধন করেছিল অন্য গ্রহের অণুজীবেরা। সেই অণুজীবেদের আক্রমণে ভবিষ্যতের পুরুষেরা পরিবর্তিত হয়েছিল না-পুরুষে। অবোলা পশুদের মতন বোধবুদ্ধিহীন হয়ে গিয়েছিল তারা।

বাংলা কল্পবিজ্ঞানের অগ্রপথিক অনীশ দেব মনে করতেন, কল্পবিজ্ঞানের গল্পে বিজ্ঞান থাকবে অল্প, বেশিরভাগটাই থাকবে কল্পনা। আমিও সেই মতে বিশ্বাসী। পাঠককে জ্ঞান দেবার জন্যে গল্প-উপন্যাস লিখি না। জ্ঞানার্জনের জন্যে পাঠ্যবই রয়েছে, প্রবন্ধের বই রয়েছে। রয়েছে স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান ক্লাসের লেকচার। অপরপক্ষে আমি নিজেকে মনে করি একজন 'এনটারটেইনার'। যে-ধারার কাহিনিই বয়ন করিনা কেন, আমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য থাকে পাঠকের মনোরঞ্জন। পাঠক যেন প্রথম থেকে শেষ অবধি একটা উপভোগ্য গল্পের রস পান, সেইদিকে নজর রাখি।

এই বইয়ের উপন্যাসদুটিও তার ব্যতিক্রম নয়। আপনারা পড়তে গেলে হয়তো বুঝতে পারবেন, দুটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেই আমার সহায় ছিল বিশুদ্ধ কল্পনা। ধ্বংসের মধ্যে টিকে থাকা ভবিষ্যতের মানবপ্রজাতির জীবনকে সেই কল্পনা দিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আর চেষ্টা করেছিলাম প্রথম থেকে শেষ অবধি প্লটের ভিতরকার থ্রিল অর্থাৎ রোমাঞ্চ বজায় রাখতে।

তবু এরপরেও একটা কথা বলার থাকে। উপন্যাসদুটি যখন দুটি জনপ্রিয় পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, তখন বহু পাঠক বলেছিলেন যে, কল্পবিজ্ঞানের আড়ালে আসলে আমি বর্তমান সমাজের কিছু ক্লেদ এবং গ্লানিকেই তীর্যক সমালোচনায় বিদ্ধ করেছি।

আমি তাঁদের সেই প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করতে পারছি না।

মনে পড়ছে, নাটাবাড়ি নার্সারিতে এমন এক রাষ্ট্রের ছবি এঁকেছিলাম, যে-রাষ্ট্র তার নাগরিকদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা দিতে পারেনি । কিন্তু তাদের জন্য বানিয়ে দিয়েছিল যন্ত্রণাহীন আত্মহত্যার ঘর। একইভাবে, না-পুরুষের পৃথিবীতে পুরুষেরা পর্যবসিত হয়েছিল যৌনতাসর্বস্ব এক বুদ্ধিহীন জীবে।

এগুলি কাল্পনিক অবস্থা ঠিকই, কিন্তু সেই কল্পনার পেছনে কি বর্তমান সমাজের নানান হীনতা নিয়ে লেখকের অশান্তি ও উদ্বেগের ছায়া নেই? আছে নিশ্চয়ই। লেখক তো আর সমাজ-বহির্ভূত কোনও জীব নন। তিনি যাই লিখুন না কেন, তার মধ্যে বর্তমান সমাজের ছায়া তো থাকবেই।

দুটি কাহিনির মধ্যে তুলনায় যেটি দীর্ঘতর, সেই না-পুরুষের পৃথিবী লেখা হয়েছিল অগ্রজ সাহিত্যিক এবং দীর্ঘদিনের শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীজয়ন্ত দের উৎসাহে। এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও তিনিই প্রথম পাঠ করেন এবং স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্যে ভূয়সী প্রশংসাও করেন। বইটি জয়ন্তদাকে উৎসর্গ করে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম ।

আর ভালবাসা জানালাম অনুজপ্রতিম দীপ্তাংশু মণ্ডল ও দীপ প্রকাশন-এর কর্মী ভাইবোনেদের। তাঁদের পরিশ্রমেই এত দ্রুত বইটি প্রকাশিত হতে পারল।

বিনত,
সৈকত মুখোপাধ্যায়

বিধাননগর, কলকাতা
৫ ডিসেম্বর, ২০২৩

সূচিপত্র

নাটাবাড়ি নার্সারি

প্রাককথন

দুর্ভিক্ষের দুনিয়ায় এখন শুধুই ক্ষুধার্তের বসবাস ।

একহাজার বছর আগে থেকেই পৃথিবীর অক্ষরেখাটা সামান্য একটু উলটোদিকে হেলতে শুরু করেছিল। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। ঘুরবার সময় একটা লাট্টুও কি আর সারাক্ষণ একই অ্যাঙ্গেলে হেলে থাকে? পৃথিবীর অক্ষরেখার ঢালও সেইরকম কয়েক লক্ষ বছর অন্তর একটু-আধটু বদলায় এবং তার ফলে কখনও তুষারযুগ আবার কখনও তাপপ্রবাহ শুরু হয়।

তো, সেই হাজার-বছর আগে অক্ষরেখা যেটুকু হেললো, তাতেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড়-উষ্ণতা বেড়ে গেল অনেকখানি। এবং শুরু হল এক চেন-রিঅ্যাকশন।

প্রথমেই পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে এতদিন ধরে যে বিপুল জলরাশি বরফের আকারে সঞ্চিত ছিল, সেই জলরাশি গলে গেল। বরফ-গলা জল হু-হু করে বাড়িয়ে দিল সবকটি সমুদ্রতলের উচ্চতা। সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়ে মহাদেশগুলোকে ডোবাতে শুরু করল। তারপরেও যেটুকু ডাঙাজমি জলের ওপরে নাক ভাসিয়ে দাঁড়িয়েছিল, অনাবৃষ্টিতে আর আগুনের মতন গরম বাতাসের প্রবাহে সেগুলোও হয়ে গেল মরুভূমি হিমযুগের আদলে এই সময়টাকে আমরা বলতে পারি দহনযুগ। দহনযুগের প্রথম পাঁচশো বছর কেটে যাওয়ার পরে একটা স্থিতাবস্থা এলো, যার পরে আর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতাও বাড়েনি, সমুদ্রের উচ্চতাও না।

তখনও ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়াও আরও দুটো মহাদেশের কিছুটা করে অংশ সমুদ্রের জলের ওপরে জেগে ছিল এবং ওই তিন-স্থলভূমিকে আঁকড়ে ধরে কুড়ি লক্ষ মানুষ তখনও বেঁচে ছিল। শান্তিতে থাকতে পারলে তারা হয়তো টিকে যেত। হয়তো ভবিষ্যতে তারা সংখ্যাতেও কিছুটা বাড়তো। কিন্তু আফটার-অল মানুষ তো। হিংস্রতা যাবে কোথায় ?

আজ থেকে ঠিক দুশো-ঊনচল্লিশ বছর আগে তিন মহাদেশের টুকরো-টাকরার দখল নিয়ে কুড়ি-লক্ষ মানুষ নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করল।

সেই লড়াইয়ে কেউ জিতল না; হেরে গেল মানবসভ্যতা। যুদ্ধের শেষে জীবিতরা দেখল, তাদের হাতে আর কিছুই নেই । কলকারখানা নেই, যানবাহন নেই, যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। পারমাণবিক বোমার আঘাতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। দুশো-ঊনচল্লিশ বছর আগের সেই যুদ্ধে, শেষ-বোমাটা ফেটে যাওয়ার পরে, তিন মহাদেশের মানুষ নিশ্চয় এ-ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিল। তাদের মধ্যে কোনও একজন হয়তো চিৎকার করে বলেছিল, 'আর কীসের জন্যে লড়ছি হে আমরা? শুধু মাটি নিয়ে কী করব? পোড়ামাটি তো আর খাওয়া যায় না।'

তার সেই চিৎকারে যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধের শুরুতে যতজন মানুষ পৃথিবীতে ছিল, যুদ্ধের শেষে দেখা গেল তার অর্ধেক ফৌত।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের তীব্র দহনজ্বালায় বাকি দুটো মহাদেশ আর বাসযোগ্য ছিল না। তাই হোমো স্যাপিয়েন্সের শেষ দশ লক্ষ স্পেসিমেন বাসা বাধলো এই ভারতীয় উপমহাদেশে। বাকি পৃথিবীর সঙ্গে তাদের আর কোনও যোগাযোগ রইল না, কারণ, যানবাহন, জাহাজ, বিমান, টেলিফোন, কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। স্যাটেলাইটগুলো তো তার অনেক আগেই জ্বলতে জ্বলতে সমুদ্রের জলে নেমে এসেছিল। নোয়ার নৌকার মতন একটুকরো জমিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার লড়াই শুরু করল শেষ দশ লক্ষ নারী-পুরুষ।

যুদ্ধের পর প্রায় আদিম অবস্থাতেই ফিরে গিয়েছিল তারা। জ্ঞানহীন, প্রযুক্তিহীন দশ লাখ মানুষ, যাদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে নারী এবং পুরুষের অনুপাত ছিল পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। কিন্তু দ্রুত শিশু এবং নারীদের সংখ্যা কমতে শুরু করল। কারণটা সহজেই অনুমেয়। যারা কেড়ে খেতে পারে না, তারাই তো মরবে। যাই হোক, এখন পৃথিবীতে মোট মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাত লাখে, যার মধ্যে নারী এবং অপ্রাপ্তবয়স্কের মিলিত সংখ্যা মাত্র তিন লাখ আর বাকি চার লাখ পুরুষ।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, এই মানুষটাই বা বেঁচে রইল কেমন করে? পাথুরে মাটিতে চাষ হয় না। নদী নেই। পাহাড়ের বুকে আঁতিপাতি করে খুঁজলে হয়তো দুয়েকটা ঝোরা পাওয়া যাবে। ভূমিজল একদমই নেই। দিনের বেলায় খোলা আকাশের নীচে বেরোলে রেডিয়েশনে ত্বক জ্বলে যায়। এরকম এক পৃথিবীতে এই সাত লক্ষ মানুষই বা বেঁচে আছে কেমন করে?

প্রশ্নের উত্তরটা এতটাই অদ্ভুত যে, শুনলে অলৌকিক বলেও মনে হতে পারে।

এই যে সামান্য ন'লক্ষ বর্গকিলোমিটার মতন জমি, যুদ্ধের পরেও সেখানে সমস্ত বোমাবাজিকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল তিনটে শহর। যুদ্ধ বাধার আগে কিছুই বোঝা যায়নি। যুদ্ধ শেষ হবার পরে বোঝা গেল ওই তিনটে শহরকে এখনকার মানুষের পূর্বজেরা ভীষণ মজবুত করে তৈরি করেছিলেন। যেন তাঁরা জানতেন, এগুলোই হবে তাদের উত্তরপুরুষের শেষ আশ্রয়। যদিও তিনটে শহরই তৈরি হয়েছিল পাঁচশো বছর আগে।

শহর তিনটেকে এখনকার মানুষ একত্রে 'কলোনি' নামে ডাকে।

সাত লক্ষ মানুষের জন্যে কলোনিতে একটা পৌরসভা আছে। আর আছে একটা সরকার। সরকারের কাজ প্রধানত পানীয় জল, বিদ্যুৎ আর খাবার সবার মধ্যে সমানভাবে বেঁটে দেওয়া। তার জন্যে রেশনিং-সিস্টেম আছে। পুলিশি ব্যবস্থা তেমন কিছু নেই। যে-দেশে সবাই সমান গরিব, সেখানে লুঠতরাজ, চুরি-ছিনতাই তো আর হবে না। তবে অন্য ক্রাইম আছে। তার সামনে সরকার হাত তুলে দিয়েছে। শুধু পুলিশ দিয়ে সবরকমের অপরাধ আটকানো যায় না। যৌন-অপরাধ তার মধ্যে একটি।

মানুষকে তাদের ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান জোগানোর জন্যে কয়েকটা পরিষেবা ছিল। সেগুলোও ওই পাঁচশোবছর আগে দূরদর্শী পূর্বজদের হাতেই তৈরি।

তাদের মধ্যে প্রথম, একটা প্রাচীন ওয়াটার-ট্রিটমেন্ট-প্ল্যান্ট। যেখানে সমুদ্রের নোনা জল থেকে সুপেয় জল তৈরি হয়। বৃষ্টি আর ভূমিজলের অস্তিত্ব যখন প্রায় নেইই, তখন ওই বিশাল ওয়াটার-ট্রিটমেন্ট-প্ল্যান্টটাই কলোনির মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। জলই জীবন ।

দুই, সুবিশাল এক সোলার পাওয়ার সেন্টার। ওই পাওয়ার-প্ল্যান্ট থেকে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তার জোরেই কিছু গাড়ি চলে, কিছু চলন্ত ফুটপাথ রাস্তার ধার ঘেঁষে লোকজন নিয়ে গড়িয়ে যায় আর আবাসন গুলোতে লিফট ওঠানামা করে। আলো পাখা ছাড়াও কিছু কিছু জরুরি ইউনিট চলে, যেগুলোর কথা আমরা পরে জানবো।

আর তিন, ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যালগি সেন্টার। ওই প্ল্যান্টন্টায় সামুদ্রিক মাছের শুঁটকি এবং সামুদ্রিক শ্যাওলার গুঁড়ো তৈরি করা হয়। এই দুটি জিনিসই এখন মানুষের প্রধান খাদ্য ; যাকে বলে স্টেপল-ফুড।

কলোনির বাইরে, পৃথিবীর শেষ গিরিশ্রেণিটির কিছু অংশ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। পাহাড়ের ছায়ায় ঘেরা উপত্যকায় রয়েছে কয়েকটা গ্রাম। ওখানে যারা থাকত তারা কলোনিতে যেতে চায়নি। সরকারও ওই গ্রামের লোকেদের আসার জন্যে কখনও জোর করেনি। তাতে কলোনির ওপরে চাপ কমেছে। তবে পাহাড়ি-লোকেরাও তাদের বরাদ্দ খাদ্য কলোনির রেশন দোকান থেকেই নিয়মিত নিয়ে যায়। নিতেই হবে, নাহলে খাবে কী?

এই হচ্ছে এখনকার পৃথিবী ; সংকীর্ণ, বিষণ্ণ, অপরাধপ্রবণ এবং আশাহীন । প্রতিটি মানুষ মুখে বিষাদের চিরস্থায়ী ছাপ, কারণ, জ্ঞান হওয়ার সময় থেকেই সে জানে, আমরা আর বেশিদিন নেই। যে-কদিন আছি, জন্তুর মতন প্রাণধারণ করে যেতে হবে। আমাদের কোনও ধর্ম থাকবে না, দর্শন থাকবে না, শিল্প-সাহিত্য

থাকবে না। আমাদের গান থাকবে না, উৎসব থাকবে না, সুদিনের আশা থাকবে না। শুধু একদিন আমাদের পায়ের পাতা বেয়ে বুকের দিকে উঠে আসবে সমুদ্রের লোনা জল। মহাজাগতিক বিকিরণে আমরা ভিতরে বাইরে ঝলসে যাব। কিংবা রেশন-দোকানের লাইনে দাঁড়িয়ে পরপর দশদিন খাবার না পেয়ে আমরা পিত্তবমি করতে করতে মরে যাব।

১

কলোনির চতুর্থ আবাসনের একশো-সতেরো তলায় অন্তরার হ্যামক। 'হ্যামক'শব্দটার আসল অর্থ যদিও দড়ির দোলনা, তবু কি জানি কেন, সাতফুট বাই আটফুটের লিভিং-স্পেসগুলোকে এখানে সবাই 'হ্যামক' বলেই ডাকে।

প্রতিটি কলোনিতে এরকম বেশ কিছু আবাসন আছে। এককালে আরও অনেক কিছুই ছিল। এখন তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বাজার-হাট, দোকানপাট, এসব কী জিনিস সেটা মানুষ অনেকদিন আগেই ভুলে গিয়েছে, কারণ, মানুষের ব্যক্তিগত উৎপাদন বলে কিছু নেই। আগেই বলেছি, সরকারি তত্ত্বাবধানে খাবার আর পোশাক তৈরি করা হয়। রেশনিং-ব্যবস্থায় সেসব জিনিস কলোনির মানুষদের মধ্যে ভাগ করে দেয় সেই সরকারই।

পাঁচশো বছর আগে, আবাসনের বাড়িগুলো যখন তৈরি করা হয়েছিল, তখনও তো মানুষ আজকের মতন দেউলিয়া হয়ে যায়নি। তাই ছোটর মধ্যেও কিছু সুবন্দোবস্ত রয়েছে। ধূসর পলিমারের দেয়াল আর ঘষা কাচের মতন গ্লাস-ফাইবারের সিলিং-এর দিকে তাকালে মনের মধ্যে ডিপ্রেশনের জন্ম হয় ঠিকই, কিন্তু ওই মেটেরিয়ালগুলো স্পেশাল। ওগুলো বাইরের রেডিয়েশনকে অনেকটাই আটকায়। তাই যতক্ষণ হ্যামকের মধ্যে থাকা যায়, ততক্ষণ অন্তত ঘরের বাসিন্দাদের চোখ জ্বালা করে না কিম্বা চামড়ায় র্যাশ ফুটে ওঠে না।

তাছাড়া প্রতিটি হ্যামকে দেয়ালের মধ্যে বিল্ট-ইন স্টোরেজ, কিচেন, টয়লেট-ইউনিট এবং বেড রয়েছে। ফলে নিজেদের মধ্যে বনিবনা থাকলে একজন কেন, দু-জনও থেকে যাওয়া যায় এরকম একটা হ্যামকে ।

অন্তরাও বছর-পাঁচেক আগে এই হ্যামকে তার এক যৌনসঙ্গীকে এনে কিছুদিন রেখেছিল। ছেলেটা শ্বেতাঙ্গ, চেহারা সুন্দর। কিন্তু বেশিক্ষণ কামেচ্ছা বজায় রাখতে পারত না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। রমণক্রিয়ার মধ্যেই বিড়বিড় করে কী যে বকত কে জানে।

ওই অবস্থায় তো সব কথা মন দিয়ে শোনা যায় না। আসন্ন অরগাজমের চোরাটানে তখন অন্তরার মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে দিয়েছে। তবু সেই তুঙ্গমুহূর্তেও একদিন ছেলেটার একটা কথা ওর মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। ও বলেছিল, মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সময়টা বড় দীর্ঘ। বেশিরভাগ স্তন্যপায়ীর থেকে অনেক বেশি দীর্ঘ। এই লম্বা আয়ুটাকে ক্রমাগত ভরিয়ে রাখার মতন উপকরণ না থাকলে মানুষ নিজের আয়ুর ভারে নিজেই পাগল হয়ে যাবে। তাই মানুষের সুখ চাই, দুঃখ চাই, আনন্দ চাই, উদ্বেগ চাই।

কদিন বাদে ছেলেটা কোথায় যেন একটা চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় বলে গিয়েছিল, আয়ুকে অন্যমনস্কভাবে কাটিয়ে দেওয়ার একটা উপায় পেলাম।

সেদিন অন্তরার বয়স ছিল চব্বিশ। আজ উনত্রিশ। এই পাঁচবছরে সে ক্রমশ আরও নিঃসঙ্গ হয়েছে। সে কোনও স্থায়ী কাজও পায়নি।

তার সুখ নেই, দুঃখেরও ঠিকঠাক অনুভূতি নেই। পেট ভরাবার জন্যে খায়, কিন্তু সেই খাবারে স্বাদ পায় না। কখনও কখনও পথচলতি কোনও পুরুষ ইশারায় তাকে জিজ্ঞেস করে, সে সেক্সে আগ্রহী কিনা। আগ্রহী বোধ করলে অন্তরা সেই পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। অধিকাংশ সময়েই ব্যাপারটা দাঁড়ায় শুধু নিয়মরক্ষায়। শুরু থেকে শেষ অবধি উদাসীনতা লেগে থাকে সেই মৈথুনে।

বাসস্থান, আহার, মৈথুন বাদ দিলে আর বাকি থাকে নিদ্রা, মানে ঘুম। ঘুম প্রায় হয়ই না অন্তরার। মাছের মতন সারারাত স্থির হয়ে ভেসে থাকলেও, চিন্তার ডানাগুলো অবিরাম নড়ে যায়। চোখ থাকে খোলা। লোকে

বলে খুব দ্রুত আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলেই নাকি মানুষের ঘুমের অভ্যাস বদলে গেছে । অন্তরা এখন বেশ বুঝতে পারে যে, ওর সেদিনের যৌনসঙ্গি মিথ্যে বলেনি। শূন্যতার চাপে ও সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছে।

তবু দু-দিন আগে অবধিও বাইরে স্বাভাবিকতার ভান বজায় রেখেছিল অন্তরা। যখন যেরকম কাজ জুটছিল, করছিল। না করলে ট্যাক্স দেবে কেমন করে? কিন্তু আজ শরীরের যন্ত্রণা অন্তরাকে চলৎশক্তিহীন করে ফেলেছে।

প্রতিবার রেপড হওয়ার পরে বেশ কিছুদিন তার হাঁটাচলার ক্ষমতা থাকে না। নড়তে গেলে মনে হয় তলপেটের ভিতরে আগুন জ্বলে উঠল। এবারেও তাই হয়েছে।

রেপ যারা করে তারা যৌনসুখ পেতে তা করে না। সে তো চাইলেই পাওয়া যায়, কারণ এই সভ্যতার অন্তিম দিনে কজনেই বা সংসার করে? প্রায় সব নারী-পুরুষই এখন নিজেরাই নিজের দেহের মালিক এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যৌনতাই এখন একমাত্র বিনোদন। তাই যৌনসুখ চাইলেই পাওয়া যায়। তবে বেশিরভাগ মানুষের কাছেই তা আর ততটা সুখকর নয়, যতটা ছিল পাঁচশো কিংবা হাজার বছর আগে।

তার চেয়ে ধর্ষণের আনন্দ এখনও অনেক বেশি। ধর্ষণের মধ্যে ততটা যৌনতা নেই, যতটা রয়েছে খুনের প্রবৃত্তি। বিনোদন হিসেবে পুরুষমানুষদের কাছে রেপ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

ঊনত্রিশ বছরের জীবনে এই নিয়ে চতুর্থবার রেপড হল অন্তরা। প্রথমবার হয়েছিল আঠারো বছর বয়সে। তার মানে, গড় হিসেবে প্রতি তিন-বছরে একবার এবং সেটা ন্যাশনাল, অ্যাভারেজের থেকে একটু বেশি। ন্যাশনাল, অ্যাভারেজ বলছে একজন নারী যতদিন উর্বর থাকে, তার মধ্যে প্রতি পাঁচ বছরে একবার রেপড হয়।

হিসেবটা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, হিসেবটা রাখা হয় ফার্টিলিটি-চীপসের মাধ্যমে; জন্মমুহূর্তেই প্রতিটি মেয়ের মস্তিষ্কে হাইপোথ্যালামাস অঞ্চলে ওই ছোট্ট চীপসটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফার্টিলিটি-চীপসের অনেকগুলো কাজের মধ্যে একটা হচ্ছে রেপের তথ্য আর্কাইভ করা। ধর্ষিতা হওয়ার মুহূর্তে একজন মেয়ের যে যন্ত্রণা, যে আতঙ্ক, অবিশ্বাস এবং বিবমিষা; তার সমস্তটাই কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারে পাঠিয়ে দিতে থাকে সেই ফার্টিলিটি-চীপস।

শুনলে মনে হবে পাকা বন্দোবস্ত। কিন্তু এর মধ্যে একটা বড় গলতি আছে। চীপসগুলো ততদিনই অ্যাকটিভ থাকে, যতদিন একজন নারী ঋতুমতী থাকে; কারণ, নারী-শরীরের প্রোজেস্টেরন লেভেল অনুযায়ী চিপসগুলো অ্যাকটিভেটেড হয়। সেইজন্যেই নাবালিকা কিংবা বৃদ্ধাদের রেপড হবার তথ্য কোথাও জমা হয় না। হলে হয়তো দেখা যেত আসলে ধর্ষণের গড় হার তিন বছরে একবার ।

কিন্তু এইসব সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে ভাবার ক্ষমতা সেই-মুহূর্তে অন্তরার ছিল না। অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণাকে ডুবিয়ে দিয়ে ওর যোনি থেকে নাভি অবধি তখন ধর্ষণের অসহ্য যন্ত্রণা পিরানহা মাছের ঝাঁকের মতন দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল।

তবু এবার অন্তরাকে উঠতে হবে। কলোনির নিষ্প্রভ পরিবেশের মধ্যে থেকে বেরিয়ে, আরও নিষ্প্রাণ, আরও নির্জন এক পৃথিবীর রাতের রাস্তায় ওকে বেরোতে হবে এবার।

হ্যামকের দেয়ালে একটা চৌকোনা কাচের স্ল্যাব বসানো রয়েছে। ওটাই জানলা। অন্তরা সামনে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র অনচ্ছ স্ল্যাবটা স্বচ্ছ হয়ে উঠল। অন্তরা দেখলো, উন্মাদের চোখের মণির মতন ঘোলাটে একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। মরা-জ্যোৎস্নার নীচে আবাসনের সাতখানা বহুতল সাতটা কবরের ফলকের মতন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের গায়ে জমাট বেঁধে রয়েছে বহু যুগের শ্যাওলা আর বিস্মৃতি।

হাজার বছর আগেও নাকি এই শহরের উত্তর-আকাশের দিকে তাকালে দেখা যেত, ইন্টার-গ্যালাকটিক স্পেস-স্টেশনের আলোয় আকাশের কিছুটা অংশ আলোকিত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝেই কোনও স্পেসশীপ জেলিফিশের মতন ধীরলয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে যেত সেই স্পেস-স্টেশনের দিকে। কিংবা ওখান

থেকে ফিরে যেত মহাকাশের কলোনিগুলোতে। নানান গ্রহ আর গ্রহাণু থেকে যান্ত্রিক রোবটেরা দামি-দামি ধাতু, তেল এইসব নিয়ে আসত মানুষের ভোগের জন্যে।

তবে সেসবই এখন গল্পকথা। এখন আর সেসব কিছুই নেই। এরোপ্লেন বানাতে পারে না যারা, তারা মহাকাশযানের কী বুঝবে? পৃথিবী এখন এক পরিত্যক্ত গ্রহ। ড্যাম টু ইটস ওন ডেসটিনি। পৃথিবীর নিয়তি এখন রোদে ভাজা হতে-হতে জলের নীচে তলিয়ে যাওয়া। মানুষের নিয়তি এখন হারিয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া ।

তবু ওই নিরানন্দ নিঝুম আকাশের নীচেই বেরোতে হবে অন্তরাকে। কারণ, ওর ফোনে ক্রমাগত সরকারি মেসেজ আসছে, 'কালেক্ট ইয়োর রেপ-প্যাকেজ ইমিডিয়েটলি । দি ভ্যালিডিটি অফ দিস অফার উইল এন্ড ইন থ্রি মোর আওয়ার্স।'

তিনদিন ভ্যালিডিটি থাকে এই অফারের, অন্তরা জানে। হিসেব-মতন আজই রাত দশটায় ওর ধর্ষণের বাহাত্তর-ঘণ্টা পূর্ণ হচ্ছে। প্যাকেজটা নিতে চাইলে ওকে এবার সত্যিই বেরোতে হবে।

অতএব উঠে বসল অন্তরা। সরে গেল বিছানার কিনারায়। সরতে গিয়েই দেখল, সাদা বিছানার চাদরের ওপরে রক্তের ছোপ, ওর নিজের রক্তের। না, এভাবে চললে ক্ষতি হয়ে যাবে, মরে যেতে পারি, এখনই আমার কিছু মেডিসিন দরকার; ভাবল অন্তরা। এবং কিছু পুষ্টিকর খাবার রেপ-প্যাকেজে এগুলোই পাওয়া যায় ।

অবশ্য এত সব করেও যে খুব বেশিদিন বাঁচা যাবে না সেটাও অন্তরা জানে। হোমো স্যাপিয়েন্স প্রজাতিটিই শেষ হতে চলেছে। অবশিষ্ট সাত-লক্ষ মানুষের দিকে অকালমৃত্যু এখন দশ-দিক থেকে তার কর্ষিকা বাড়িয়ে দিয়েছে। কোনওটার নাম অন্নাভাব, কোনওটার নাম দাঙ্গা, কোনওটার নাম ধর্ষণ। মহামারী, রেডিয়েশন কিংবা স্থলভূমির নিমজ্জন। মৃত্যুর অকালটা কত সকাল-সকাল আসে, সেটাই শুধু দেখার। দশ বছর? কুড়ি বছর? নাকি আর কয়েক মাস?

তবু ওকে যেতে হবে। সংগ্রহ করতে হবে রেপ প্যাকেজ। ও সুইচ টিপে দেয়াল থেকে ওর সর্বার্থসাধক স্টোরেজ-বক্সটা বার করে আনলো। এর মধ্যেই ওর ফ্রিজিডেয়ার। এর মধ্যেই ওর চেস্ট এবং পোশাকের আলনা।

পোশাক বদলানোর পর সবকটা চৌখুপির ওপরে একবার আলতো করে চোখ বুলিয়ে নিল অন্তরা। দেখার মতন তেমন কিছু নেই। যা আছে সবই তার মুখস্থ। গত চার বছরে সে কোনও নতুন পোশাক কেনেনি। পারেনি কিনতে। সে একা নয়। কলোনির সকলেরই এক হাল। কারুর হাতেই পয়সা নেই। শুকনো অ্যালগী আর শুটকি মাছের ডাস্ট, এইদুটো জিনিস রেশন দোকান থেকে পাওয়া গেলেও, সেগুলোকে ফুটিয়ে নেওয়ার মতন সোলার-এনার্জি কিনবার পয়সাও মাঝে-মাঝে ফুরিয়ে যাচ্ছে।

স্টোরেজের ভিতর থেকে একটা রং চটা ব্যাকপ্যাক বার করে পিঠে ঝুলিয়ে নিল অন্তরা। তারপর সুইচ টিপে স্টোরেজ-বক্সটাকে আবার দেয়ালের গর্ভে ঢুকিয়ে দিয়ে, হ্যামকের দরজা লক করে, লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

দীর্ঘ সময় নিয়ে লিফটটা নীচ থেকে একশো-সতেরো তলায় উঠল। লিফটের জন্যে আরেকজন অপেক্ষা করছিলেন; ডি-ব্লকের মিস্টার ওডিয়াম্বো। হারিয়ে-যাওয়া আফ্রিকা মহাদেশের মানুষ। সেই মহাদেশ বহুকাল আগেই তলিয়ে গিয়েছে। ওঁর পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধের সময় এখানে এসেছিলেন।

মিস্টার ওডিয়াম্বোর পঁচাশি বছর বয়স। ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন আগে। কিছুদিন আগে অবধিও মিস্টার ওডিয়াম্বো বেশ হাসিখুশি এবং চটপটে ছিলেন। সম্প্রতি সেই মানুষই কেমন যেন জবুথবু হয়ে পড়েছেন।

একদিন আর না পেরে অন্তরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হয়েছে মিস্টার ওডিয়াম্বো?' উনি খুব দুঃখিত-মুখে জানিয়েছিলেন, বয়স্ক মানুষদের জন্যে যে-কটা সরকারি স্কিম ছিল, সবকটাই গত তিন বছরের মধ্যে বন্ধ

হয়ে গেছে। এমনকি চিকিৎসা পরিষেবা অবধি। ওঁর অথর্ব এবং অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণটা বুঝতে আর অসুবিধে হয়নি অন্তরার ।

'এত দেরি করছে লিফটটা উঠতে'। চুপ করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকাটা অভদ্রতা হয় বলেই কথাগুলো বলল অন্তরা।

মিস্টার ওডিয়াম্বো বললেন, 'আর বেশিদিন চলবে না। লিফটের ম্যাগনেটিক প্যানেলগুলোর অর্ধেক নষ্ট হয়ে গেছে। মেইন্টেন্যান্স ছাড়া কলকব্জা চলে?'

লিফটটা ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল। ভিতরে ঢুকতে-ঢুকতে অন্তরা বলল, 'তাহলে কী হবে, মিস্টার ওডিয়াম্বো? লিফট না চললে আমরা এই একশো-সতেরো তলায় উঠব কেমন করে ?"

মিস্টার ওডিয়াম্বো হাসলেন। ওঁর চোখদুটোও হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বললেন, 'আমি আর উঠবো না। নীচেই থেকে যাব'।

রাস্তায় বেরিয়ে মিস্টার ওডিয়াম্বো যে কোনদিকে চলে গেলেন, অন্তরা আর তাঁকে দেখতে পেল না। সাইকেল সে আজ চালাতে পারবে না, কারণ, তার উরুসন্ধিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ভেবেছিল মোবিপাথ ধরে চলে যাবে। কিন্তু রাস্তা পেরিয়ে মোবিপাথের কাছে গিয়ে দেখল, সিস্টেমটা আক্ষরিক অর্থে লালবাতি জ্বালিয়ে বসে আছে। মানে অচল। শহরের লাইফ-লাইন বলা যায় এই চলমান ফুটপাথগুলোকে। একবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়লে ধীরেসুস্থে অনেক দূর চলে যাওয়া যায়। সেই জিনিসও অচল! লিফট চলবে না, মোবিপাথ চলবে না। মানুষ বাঁচবে কেমন করে?

রাস্তার অন্যদিকে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। মঙ্গোলয়েড চেহারার এক যুবতী, সম্ভবত চীনের মেয়ে, কুড়ি-বাইশ বছর বয়স হবে, অন্তরাকে দেখতে পেয়েই ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়েছিল। জানলা দিয়ে ওকে ইশারা করল চলে আসতে। অন্তরা উঠে বসার পর মিটার ডাউন করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাবেন ?

'ভেন্ডিং-প্লাজায়', উত্তর দিল অন্তরা।

'ভাড়াটা ক্যাশে দেবেন প্লিজ । কুপন দিয়ে কিনবার মতন কিছু খুঁজে পাচ্ছি না আজকাল', মেয়েটি বলল।

অন্তরা বলল, 'বেশ'।

'আপনি ভেন্ডিং-প্লাজার কোনদিকটায় নামবেন ? " 'রেপ-কিয়স্কের দিকটায়।'

'ওহ!" কিছুক্ষণ আর কোনও কথা বলল না মেয়েটি। তারপর খুব নীচুগলায় বললেন, 'ইটস পেইনফুল। আই ওয়েন্ট থ্রু ইট ফর দা সেকেন্ড-টাইম অনলি সিক্স মান্থস ব্যাক।"

অন্তরাকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে সে বলল, 'আমরা বড্ড স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি আজকাল। আসলে অভাব আমাদের স্বভাব নষ্ট করে দিচ্ছে। না ম্যাডাম, আপনি কুপনেই পেমেন্ট করুন। আমি চালিয়ে নেব।'

ট্যাক্সি থেকে নেমে, কিছুটা হেঁটে অন্তরা রেপ-কিয়স্কের সামনে পৌঁছল। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল বলেই বোধহয় কিয়স্কের সামনে তখন মেয়েদের ভিড় ছিল না, কিন্তু ভিতরে একজন কেউ ছিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সে বেরিয়ে এল। একটি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে; পরীর মতন দেখতে কিন্তু দু-চোখের নীচে গাঢ় কালি। অন্তরার পাশ কাটিয়ে রাস্তার দিকে চলে যেতে-যেতে দু-হাতের পাতা উলটে মেয়েটি যে ইশারায় কী বলে গেল অন্তরা বুঝতে পারল না।

কিয়স্কের ভিতরে ঢুকে অন্তরা ভেন্ডিং-মেশিনের প্যানেলে নিজের ডান হাতের পাতাটা ছোঁয়ানো মাত্রই স্ক্রিনে ওর নাম ধাম এবং রেপড হবার যাবতীয় দিনক্ষণ, ডিউরেশন ইত্যাদি ফুটে উঠল। তারপরে যে লেখাটা ফুটে উঠল, সেটার জন্যে অন্তরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। মেশিন তাকে জানালো, এই-মুহূর্তে রেপ-প্যাকের জোগান নেই। সরকার এ জন্যে খুবই দুঃখিত। তবে তার ক্লেম-পিরিয়ডের ভ্যালিডিটি আরও সাতদিন বাড়িয়ে দেওয়া হল। জোগান এসে গেলে সে সাতদিনের মধ্যে আবার অ্যাপ্লাই করে মেডিসিন, ফুড ইত্যাদি নিয়ে যেতে পারবে।

নিষ্ফল আক্রোশে অন্তরা মুঠি পাকিয়ে ভেন্ডিং-মেশিনের ধাতুর দেয়ালে একটা ঘুষি মারল। তারপর এক ঝটকায় কিয়স্কের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

রাত দশটা বাজে। রাস্তাঘাট পুরো শুনশান। পৃথিবীতে মানুষ বড় কম, তাই রাস্তাঘাট বেশিরভাগ সময়ে জনবিরল থাকে। এখন, এত রাতে তো পুরোপুরিই শ্মশান হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় অন্তরার মাথায় প্রথম যে চিন্তাটা আসা উচিত ছিল, সেটা হল, আমি বাড়ি ফিরব কীভাবে।

কিন্তু না। সে ভাবল, আমি বাড়ি ফিরব কেন? আমি কার কাছে ফিরব? মাথা নীচু করে অন্তরা ভূতগ্রস্তের মতন হেঁটে চলেছিল। ভাঙাচোরা রাস্তার দু-ধারে অনেকটা ব্যবধানে একটা করে ল্যাম্পপোস্ট। বেশিরভাগই আলোহীন, অন্ধ । বাতাসে ভিজে মোজার মতন ভ্যাপসা একটা গন্ধ, যেমন সবসময়েই আজকাল থাকে। বেশ বড়সড় একটা চতুষ্পদ প্রাণী কিছুটা দূরে রাস্তা পেরোলো। রাস্তা পেরোনোর সময় জন্তুটা একবার মুখ তুলে অন্তরার দিকে তাকালো। জ্বলজ্বল করে উঠল দুটো সবুজ চোখ এককালে অন্য গ্রহের নাগরিকেরা পৃথিবীতে আসার সময় নিজেদের গ্রহ থেকে কিছু পোষ্য নিয়ে এসেছিল। ওরা চলে যাবার সময় তাদের সবকটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়নি। সেই প্রাণীগুলোই এখন বুনো হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে তাদের আক্রমণে মানুষ মারা যাওয়ার খবরও পাওয়া যায়।

তবে এসব কিছুই তখন অন্তরার ভিতরে পৌঁছচ্ছিল না। মাথার মধ্যে অদ্ভুত এক শূন্যতা নিয়ে সে যেন ঘুমের ঘোরে হেঁটে চলেছিল। হঠাৎই তার হুঁশ ফিরল। হুঁশ ফিরল, কারণ সে বুকে সামান্য চাপ অনুভব করছিল। সামান্য নিশ্বাসের কষ্ট। সে খেয়াল করল, সমতল রাস্তা ছেড়ে সে একটা চড়াই-পথে উঠতে শুরু করেছে।

কোথায় চলেছে সে?

অন্তরা একটু থামল। চারিদিকে একবার নজর চালিয়ে সে বুঝতে পারল, সে চলেছে ভেন্ডিং-প্লাজার সেই দিকটায়, যে-দিকে সে যেতে চায়নি কখনো । সে সুইসাইড-কিয়স্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সে শুনেছিল বটে, এইদিকে, এই জঙ্গলে ঢাকা রাস্তা ধরে কিছুটা হাঁটলে এবং তারপর কিছুটা চড়াই ভাঙলে, সুইসাইড কিয়স্কের সামনে পৌঁছনো যায় ।

অন্তরা ভারী অবাক হয়ে ভাবল, সে কেন এখানে এল? তার কাছে বাড়ি ফেরা আর এই-মুহূর্তে কিয়স্কে ঢুকে পড়া, দুটোর মধ্যে কি আর কোনই তফাত নেই? বাঁচা আর মরায় কোনোই তফাত নেই আর?

তাহলে কি আত্মহত্যাই করব? ভাবতে-ভাবতে অন্তরা পৌঁছে গেল ছিমছাম সুন্দর বাড়িটার সামনে।

রেপ-কিয়স্কে ওষুধ এবং খাবার না থাকলেও, মোবিপাথ এবং আবাসনের লিফট ঠিকঠাক না চললেও, এই কিয়স্কটিকে এখনও পুর-কর্তৃপক্ষ সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। কোনও কার্পণ্য নেই এখানে। অবিকল ছোটদের পুতুলবাড়ির মতন দেখতে বাড়িটা। গোলাপি ছাদ, কচি-কলাপাতা রঙের দেয়াল । অন্ধকার রাস্তার শেষে বাড়িটা স্বপ্নের নরম আলো মেখে দাঁড়িয়েছিল।

অন্তরা গেট খুলে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ঢালু ছাদের বাংলো-বাড়ির মতন দেখতে হলেও, এটা আসলে একটা ঘর। একটাই বড় ঘর, যার সামনে একটাই দরজা। বাকি সব দরজা জানলা দেয়ালের গায়ে আঁকা...নকল। সত্যিকারের দরজাটা তখন বন্ধ ছিল। দরজার মাথায় একটা উজ্জ্বল লাল আলো জ্বলছিল, যে-আলোর চতুষ্কোণের গায়ে লেখা ছিল 'এনগেজড'।

দরজার পাশে খুব সংক্ষেপে লেখা ছিল সুইসাইড-কিয়স্কের কার্যপদ্ধতি । সাধারণের বোধগম্য ভাষায় জানানো ছিল, কীভাবে ইচ্ছুক আত্মহত্যাকামী তার পোশাক বাদে আর যাবতীয় সম্পত্তি, যথা— ফোন, ব্যাগ ইত্যাদি বাইরে রেখে এই ঘরে ঢুকবে এবং ঘরের ভিতরে ঢুকলে সে দেখতে পাবে একটি আরামদায়ক চেয়ার। কীভাবে সেই চেয়ারটায় তাঁকে গা এলিয়ে দিতে হবে এবং গা এলিয়ে দিলে কীভাবে দুটি যান্ত্রিক কোমল হাত তাঁকে জড়িয়ে ধরবে । জানানো ছিল তারপরেই কেমন করে তার শরীরটা অণু-পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর আনাচেকানাচে; যন্ত্রণাহীন মরণ হবে তার।

সব শেষে খুব বড়-বড় অক্ষরে লেখা ছিল, 'এই ঘরে ঢুকছেন মানেই আপনি আত্মহত্যায় সম্মতি জানাচ্ছেন। এর পরে যাই ঘটুক তার জন্যে সরকারের কোনও দায় থাকবে না। সরকার শুধু আপনার ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে আপনার মৃত্যুকে সুন্দর ও সহজ করার কাজটুকু করছে।'

বিজ্ঞপ্তিটা পড়া শেষ করে অন্তরা ভাবতে বসল, সেই-ছেলেটা, সেই যে সঙ্গমের সময় উদাসীন হয়ে পড়ত, সে এখন এখানে থাকলে কী বলত ? বলত না কি, ঘরের ভিতরে ঢোকার পরে রাষ্ট্রের দায় না থাকতে পারে, কিন্তু একটি মানুষ যখন সুইসাইড-কিয়স্কে ঢোকার কথা ভাবছে, হেঁটে আসছে এইদিকে, তার দায় রাষ্ট্রেরই।

অন্তরার এইসব সাত-পাঁচ চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ তাকে ভয়ংকর চমকে দিয়ে দরজার মাথার ওপরে একটা ছবি ফুটে উঠল। অর্থাৎ যিনি ভিতরে ছিলেন তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হল। ওটা তাঁরই মুখের ছবি। ছবিটার নীচে লেখা ফুটে উঠল 'গুডবাই, মিস্টার ওডিয়াম্বো। রেস্ট ইন পিস।'

একটু আগেই এই মানুষটির সঙ্গে সে একসঙ্গে লিফট ধরে নীচে নেমেছিল। উনি বলেছিলেন 'আমি আর ওপরে উঠবো না।'

দরজার মাথার আলোটা লাল থেকে সবুজ হয়ে উঠল। যান্ত্রিক গলা ঘোষণা করল, 'লাইনে এরপরে যিনি রয়েছেন, তিনি ভিতরে আসতে পারেন'।

অন্তরা কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে দরজাটার দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন তাকে ডাকল। ছোট বাচ্চার রিনরিনে গলায় ডাকল, 'আন্টি'।

সেই ডাকে যেন এক গভীর সম্মোহন থেকে জেগে উঠল অন্তরা। সুইসাইড কিয়স্কের এতটাই কাছে সে পৌঁছে গিয়েছিল যে, পাল্লার নতুন রঙের গন্ধটাও তার নাকে লাগছিল। সেখান থেকে এক-ঝটকায় সে অনেকখানি পিছিয়ে এল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে দেখল গেটের বাইরে কিছুটা আলোয়, কিছুটা অন্ধকারে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখটা মিষ্টি কিন্তু পাকা-পাকা । চোখদুটো খুব ইনটেলিজেন্ট। বাচ্চাটা স্কুল-ইউনিফর্ম পরে আছে ; সাদা জামা আর নেভি-ব্লু হাফপ্যান্ট। পিঠে স্কুলব্যাগও রয়েছে।

আতঙ্কিত অন্তরা নিজের ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিয়ে প্রায় দৌড়েই বাচ্চাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে কী করছ, এত রাতে? তোমার গার্জিয়ানরা কোথায়? বাড়ি থেকে পালিয়েছ?'

বাচ্চা ছেলেটা তার একটা কথারও উত্তর না দিয়ে উলটে প্রশ্ন করল, 'সুইসাইড করার দরকার নেই। তুমি আমার সঙ্গে একজায়গায় চলো।'

বাচ্চাটার চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা কিছু ছিল যে, অন্তরা বুঝল, এর সঙ্গে ভীষণ মনোযোগ দিয়ে কথা বলতে হবে। তাছাড়া, যে-পৃথিবীতে গত বারো বছর কোনও শিশুর জন্ম হয়নি সেখানে এই একটি পাঁচবছরের বাচ্চা যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এটাও খুব আশ্চর্যজনক ঘটনা। এরও ব্যাখ্যা চাই । একে হালকাভাবে নিলে চলবে না।

কিন্তু এতকিছু ভাবার পরেও হঠাৎই অন্তরার স্নায়ুগুলো কেমন যেন শিথিল হয়ে গেল। খুব আরামদায়ক পরিবেশে একটা নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিলে যেরকম লাগে, সেরকম। সে জড়ানো গলায় প্রশ্ন করল, 'কোথায়?' বাচ্চাটা অন্তরার হাত নিজের ছোট্ট মুঠির মধ্যে ধরে বলল, 'আমাদের স্কুলে। নাটাবাড়ি নার্সারিতে।'

২

'গুড ইভনিং মিস্টার ভুটিয়া!'

'গুড ইভনিং ডক্টর আহমেদ! মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে। সঙ্গে ছাতা এনেছেন তো?'

‘না। আমার ছাতাটা ভেঙে গেছে। নতুন ছাতা কিনবার পয়সা নেই। আর শুনুন! প্লিজ স্টপ কলিং মি ডক্টর।’

‘হোয়াই শুড আই ডক্টর আহমে’? আপনি বারবার কেন এই-কথাটা বলেন বুঝতে পারি না। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি আপনাকে ডক্টর বলে ডেকে আসছি। এখন আপনি বললেই রাতারাতি সেই ডাক বদলে ফেলতে পারি নাকি?”

‘বুঝতে পারেন না, কেন বলি? আমি ছিলাম একজন ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ । কিন্তু গত বারো বছর আমি কোনও প্রসূতির চিকিৎসা করিনি। বারো বছর আগে পৃথিবীর শেষ মানব সন্তানটি আমার হাতেই জন্ম নিয়েছিল। তারপর থেকে পৃথিবীতে আর কোনও শিশুর জন্ম হয়নি। সো আই হ্যাভ এ লস্ট টেড।'

‘তাতে কী হয়েছে ডক্টর আহমেদ'? ওয়ান্স আ ডক্টর, অলওয়েজ আ ডক্টর'।

‘নো। নো। অ্যাবসল্যুটলি নট। একটা নদী যখন শুকিয়ে যায়, তখন তার খেয়াঘাটের মাঝিকে কি কেউ আর মাঝি বলে ডাকে, মিস্টার ভুটিয়া ? তখন সেই মাঝি হয়তো চাষি হয়ে যায়। কিংবা দোকানি। আমিও যেমন এখন সেন্ট্রাল ড্রাগ স্টোরের একটা ঘরে, আরও কুড়িজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে বসে, রেপ-প্যাকেজের সেট তৈরি করি। তুলো এক বান্ডিল, অ্যান্টিসেপটিক দু-টিউব, ঘুমের ওষুধ এক স্ট্রিপ, এটসেটরা এটসেটরা। সো ইউ ক্যান কল মি এ ডিস্ট্রিবিউটর। আ প্যাকেজার। অর হোয়াটেভার ইউ ওয়ান্ট। বাট নেভার কল মি আ ডক্টর। '

দুই বৃদ্ধের মধ্যে কথোপকথন চলছিল। দুজনেরই বয়স পঁয়ষট্টি প্লাস। ওঁরা এক পাহাড়ি-গ্রামের রাস্তা ধরে পাশাপাশি হেঁটে চলেছিলেন। হিমালয়ের কোলে সেই গ্রামটার নাম কালিমোনাল মিস্টার ভুটিয়ার পুরো নাম সেন্ডুপ ভুটিয়া । বেঁটেখাটো গাট্টাগোট্টা চেহারা । মাথায় কদমছাট করে ছাটা কাঁচাপাকা চুল, চোখে পুরু কাচের চশমা এবং হাতে সবসময়ের সঙ্গী একটি ছড়ির মতন লম্বা, ভাঁজ করে রাখা ছাতা। দ্বিতীয়জন ডক্টর রফিক আহমেদ। ছিপছিপে চেহারা। ছ-ফিটের ওপর লম্বা । ধারালো নাকমুখ। পরিষ্কার করে কামানো গোঁফদাড়ি।

দুজনেরই পরনে শার্ট, সোয়েটার এবং ট্রাউজার। মিস্টার ভুটিয়ার পায়ে স্যান্ডাল, ডক্টর আহমেদের স্বীকার। একটু খেয়াল করে দেখলেই বোঝা যায় পোশাকগুলো দামি কিন্তু পুরনো। সোয়েটারের কনুইয়ের কাছে উলের বুনন খুলে জালের মতন হয়ে গেছে। ট্রাউজারের কোমর অত্যধিক টাইট, উপরন্তু রং চটা। শার্টের কলারের কাছে কাপড় ফেটে গেছে। জুতোগুলোতেও তাপ্পি দেখা যায়। অর্থাৎ এককালে ওঁরা স্বচ্ছল ছিলেন, এখন অবস্থা পড়ে গেছে।

ডক্টর আহমেদের সংসার বলতে তিনি নিজে, তাঁর স্ত্রী ইসথার আর মেয়ে আসমানি। ইসথার একজন ধাত্রী, যাকে চলিত ভাষায় বলে ধাইমা। প্রসবে সাহায্য করা থেকে সদ্যোজাত শিশুর যত্ন নেওয়াই ছিল তার কাজ। বলাই বাহুল্য, এই অপ্রসবের দিনে তিনিও তার স্বামীর মতন কর্মহীন। আর আসমানি ।

আসমানি যে কী তা বলা মুশকিল ।

পৃথিবীর শতকরা বেশিরভাগ স্থলভূমি যখন বহুবছর ধরে ধীরে-ধীরে সমুদ্রের নীচে তলিয়ে যায়, তখন সে তো আর শুধু ঘরবাড়ি ইমারত নিয়ে তলায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প সবকিছু নিয়েই তলায়। অবশিষ্ট স্থলভূমির বুকে বেঁচে থাকে সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান আর শিল্পকলার টুকরো-টাকরা কিছু অংশ ।

আঠেরো বছর বয়স থেকে আসমানি ভারতীয় উপমহাদেশ আর দক্ষিণ-এশিয়ার কলোনিগুলোতে ঘুরে-ঘুরে, সেই অতীত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে নিজের পছন্দমতন জ্ঞান কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখন তার বয়স একত্রিশ। বছরে দু-তিনবার হঠাৎ করে সে কালিমোনালে নিজের বাড়িতে এসে উদয় হয়।

বাড়িতে ঢুকেই আসমানি ইসথারকে জড়িয়ে ধরে অনেকগুলো চুমু খায় । ডক্টর আহমেদের হাতে বহু কষ্টে জোগাড় করে আনা এক-শিশি সুগন্ধী কিংবা একটা উলের স্কার্ফ তুলে দেয়। তারপর বাবা-মার সঙ্গে

জমিয়ে আড্ডা মারতে বসে। এবারের যাত্রায় জ্ঞানসমুদ্রের ধ্বংসাবশেষ ঘেঁটে কোন আশ্চর্য তথ্য কুড়িয়ে আনতে পেরেছে, উজ্জ্বল চোখে তাই বলে যায় সে বাবা-মাকে।

সেই-সুযোগে ইসথার আসমানির আলট্রা ভায়োলেট-রে লেগে পুড়ে-যাওয়া চামড়ায় কিছু পাতাপুতার মলম লাগিয়ে দেন। ছিঁড়ে-যাওয়া জামাকাপড়গুলো রিফু করেন। গ্রামের মুচিকে দিয়ে নতুন একটা জুতোও বানিয়ে দেন, যদি হাতে পয়সা থাকে। আর ডক্টর আহমেদ স্মৃতি হাটকে বার করার চেষ্টা করেন, আসমানি তাকে যে তথ্যটা শোনাচ্ছে, সেটা বিজ্ঞানের কোন শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ফিজিক্স? কেমিস্ট্রি? বায়োলজি ? আসলে তিনি জানেন, তার খ্যাপা মেয়েটা যা খুঁজে এনেছে, সেটা বিরাট এক মেশিনের একটা ছোট্ট পার্ট। কিংবা দেয়ালজোড়া রঙিন ক্যানভাসের ছেঁড়া একটা টুকরো । তাই দিয়ে কিছুতেই বোঝা যাবে না, পাঁচশো বছর আগে হিউম্যান সিভিলাইজেশন কোন উচ্চতায় পৌঁছেছিল।

তারপর আবার একদিন আসমানির মনের ভিতরের যাযাবরী-টা জেগে ওঠে। হঠাৎ করেই সে আবার উধাও হয়ে যায়।

আসমানির কাছেই এখনো অবশিষ্ট দুনিয়ার হালচাল শুনতে পান ওঁরা। শুধু ডক্টর আহমেদই নন, ইসথারও পান। আর এই সেন্ডুপ ভুটিয়ার মতন দুয়েকজন প্রতিবেশী বন্ধু যারা আছেন, তাঁরাও মন দিয়ে শোনেন আসমানির কথা।

আসমানি যা বলে তার মধ্যে ভালো খবর প্রায় কিছুই থাকে না। দুঃসংবাদ, কেবলই দুঃসংবাদ। ওঁরা শোনেন, কীভাবে মেইন্টেন্যান্সের অভাবে ভেঙে পড়ছে পুরনো মোবিপাথ, স্কাইলিফট এমনকি পানীয় জলের প্ল্যান্টগুলো অবধি ।

শোনেন অসংখ্য কর্মহীন মানুষের মধ্যে বেড়ে চলা ক্রাইমের প্রবণতার কথা। স্কুল, অফিস, কারখানার মতন মেলামেশার জায়গাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে প্রত্যেকটা মানুষই এখন নিজের একটা ছোট দ্বীপে বন্দি । দ্বীপে বন্দি মানুষের মতোই তারা ক্ষিপ্ত, বিরক্ত এবং হিংস্র ।

এইসব কথা শুনতে-শুনতে এসথার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, ‘সব ঠিক হয়ে যেত, যদি মানুষের ঘরে এখনও শিশু আসত। গান, ফুল, পাখি, নীল-আকাশ; সবার অভাব দূর করে দিত একটি শিশুর ফোকলা-দাঁতের হাসি। ওদের চুলের পাউডার-পাউডার গন্ধ, ওদের তুলতুলে ঠোঁটের নালঝোল মাখা হামি; সে যে চিরকাল কত দুঃখী মা-বাবার দুঃখে প্রলেপ লাগিয়েছে, সে তো আমরা বুড়োবুড়িরা জানি। এমন কপাল, বারোবছর হয়ে গেল, পৃথিবীতে একটাও বাচ্চা জন্মালো না। এ যে কি অভিশাপ!’

রফিক আহমেদ তিক্ত হেসে বলেন, ‘ওসব অভিশাপ-টভিশাপের কথা বলো কেন? ইট ইজ নেচার হু প্রিভেন্টস প্রেগন্যান্সি। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে এটা বহুযুগ ধরেই ছিল; পাখিদের মধ্যে, খরগোশ-টরগোশের মতন নীচের ধাপের স্তন্যপায়ীদের মধ্যে। খাবারের আকাল দেখা দিলে, বাসস্থান কম পড়লে ওদের গর্ভাধানও বন্ধ হয়ে যেত। আবার পরিবেশ অনুকূল হলে মেয়ে পশুপাখিরা গর্ভবতী হত। এখন প্রকৃতিদেবী মানুষের ক্ষেত্রেও সেই একই বিচক্ষণতার পরিচয় দিচ্ছেন। বাচ্চা জন্মালে এখন তাদের বড় করা যেত? সমুদ্রের শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে-থাকা মায়েদের স্তনে দুধ আসত ? কী খেত দুধের শিশুগুলো? সেইজন্যেই মানুষের জন্ম বন্ধ হয়ে গেছে। আর সেইজন্যেই, মিস্টার ভুটিয়া, আমি আপনাকে বলছি, আমাকে ডক্টর বলে ডাকা বন্ধ করুন । হোয়েন দেয়ার ইজ নো বার্থ, দেয়ার ইজ নো অবস্টেট্রিসিয়ান আইদার।'

সেন্ডুপ ভুটিয়া ওদের বৈঠকখানায় বসেই স্বামী-স্ত্রীর এইসব কথা শোনেন । শুনতে-শুনতে মদের গ্লাসে চুমুক দেন। ঘরে তৈরি মদ। আশেপাশের কিছু জংলি বীটের মূল থেকে সেন্ডুপ নিজেই যা বানিয়ে নেন। তিনি নিজেও পান করেন, অনেকদিনের বন্ধু আহমেদকেও মাঝে-মাঝে এক বোতল দিয়ে যান।

তিন-শহরের বাইরে ওই পাহাড়টার খাঁজে-খোঁজে এখনও কালিমোনালের মতন দু-দশটা এরকম ছোট ছোট গ্রাম রয়ে গেছে। এই গ্রামগুলোয় জীবন এখনও কিছুটা সহজ। কারণ, গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে এখনও পরিবারের বাঁধন আছে। প্রতিবেশী আর বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা আছে।

সবচেয়ে বড় কথা, এখনও ওদের নিজস্ব কিছু পালিত পশু, কিছু চাষযোগ্য জমি আছে। পাহাড়চূড়ার তুষার উবে গেলেও, মাটির নীচে কোথায় জল রয়েছে তা ওইসব গ্রামের অধিবাসীরা জানে। সেই জলে ওরা চাষ করে। তবে ফসল ওঠে খুবই সামান্য। প্রতিটি পরিবারের নিজেদের বারোমাসের চাহিদাটুকুই শুধু মেটে তাতে, বাইরের লোককে খাওয়ানো যায় না। সেইজন্যে ডক্টর আহমেদ কিংবা সেভুপের মতন মানুষেরা অপরাধবোধেও ভোগেন।

ডক্টর আহমেদের কথা শুনে সেভুপ বলেন, ‘কথাটা মনে হয় ঠিকই বলেছেন। আমার ছোটবেলায় মাঝে-মাঝে দাদুর হাত ধরে পাহাড়ের অনেক ওপরে একটা জায়গায় যেতাম।'

‘বেড়াতে যেতে?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর আহমেদ।

‘আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল বেড়ানোই। তবে দাদু একটা কাজ নিয়ে যেত। ওখানে এক সাহেবের একটা ফার্ম-হাউস ছিল। ঘোড়া, ভেড়া, গরু থেকে শুরু করে তিতির পাখি, বটেরপাখি অনেককিছুই পালতো সাহেব । দাদু আমাদের খেতের মিলেট, রামদানা, মকাই এইসব বিক্রি করতে যেত ওই সাহেবকে। সাহেবের পোষা পাখি আর জন্তুরা ওইসব দানা খেত।'

‘তা, হঠাৎ আমার কথা শুনে তোমার ওই সাহেবের ফার্মহাউসের মনে পড়ল কেন?'

‘মনে পড়ল, কারণ, ওই সাহেব একসময় জন্তু-জানোয়ার আর পাখিগুলোকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে নিজে পাহাড় থেকে নেমে তিন-শহরের দিকে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় একবার আমাদের ঘরের উঠোনে ঢুকে হাঁক দিয়ে দাদুকে বলে গিয়েছিলেন, চললাম উর্গেনদাজু। ফার্মিং আর চালাতে পারলাম না ।

‘দাদু হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, সেকি সাহেব! কেন ? ‘পাখিই বলুন আর জন্তুই বলুন, ওরা বন্দি অবস্থায় আর বাচ্চা দেবে না। সেইজন্যে ওদের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলাম ।

‘আমার দাদু অবাক হয়ে বলল, কিন্তু এতদিন তো দিত।

‘দিত। কিন্তু এখন নিশ্চয় আবহাওয়া আরও একটু গরম হয়েছে। ঘাসের মধ্যে, দানা-খাবারের মধ্যে আরও একটু তেজস্ক্রিয়তার বিষ ঢুকেছে। আমার তিতির, বটের, ভেড়া, ঘোড়ারা নিশ্চয় বুঝতে পারছে ওরা বাচ্চা দিলে সেই বাচ্চার শরীরেও বিষ ঢুকে যাবে, বাচ্চাগুলো আর বাঁচবে না। ইন-ফ্যাক্ট, এর মধ্যে যতগুলো মুরগি ডিম দিয়েছিল, প্রত্যেকটা ডিমের খোলা হয়েছিল এত পাতলা যে, ওরা তা দিতে বসলেই ডিমগুলো ভেঙে যাচ্ছিল।

‘তারপর একটু থেমে সাহেব বলেছিল; বুঝলেন উর্গেনদাজু, আমরা সাত-পুরুষের ফার্মার অ্যান্ড ব্রিডার। জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চা তোলাই আমাদের গুষ্টির পেশা। কিন্তু গত বছরখানেক ধরে যা দেখছি, সেরকম অদ্ভুত জিনিস না আমি দেখেছি, না আমার ফাদার গ্র্যান্ডফাদার দেখেছে। দেখছি কি, আমার জন্তুগুলো বাড়ছেই না। যেন চিরশৈশব ধরেছে শালাদের... শালিদেরও।

‘আপনার কথা শুনে আমার ছোটবেলার সেই সাহেবের কথাই মনে পড়ে গেলদ, এই বলে চুপ করে গেল সেভুপ ভুটিয়া।

ইসথার করুণ গলায় বললেন, ‘মৃত্যু আছে, জন্ম নেই। তাহলে তো হারিয়ে যাওয়াই আমাদের নিয়তি।'

সেভুপ ভুটিয়া হাতের খালি গ্লাসটা নিয়ে বৈঠকখানার পেছনে বাগানটার দিকে চলে গেলেন। অন্ধকার বাগানের মধ্যে বুড়ো ওকগাছের গুড়ির নীচে একটা পাথরের কুণ্ড ছিল। ছোট একটা গর্ত। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না, কুণ্ডটার নীচ দিয়ে কুলকুল করে ঠান্ডা জলের একটা স্রোত বয়ে চলেছে। গর্তের মধ্যে হাত ডুবিয়ে মদের গ্লাসটাকে ধুয়ে ফের বৈঠকখানা ঘরে ফিরে এলেন সেভুপ। এবার উনি বাড়ি ফিরবেন। জুতোয় পা গলাতে-গলাতে ইসথারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেটির কী খবর? এবার অনেকদিনের গ্যাপ পড়ে গেল যে।’

ইসথার সেভুপের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতন বললেন, ‘ছ’মাস। ভাবতে পারেন, ছ'মাস হয়ে গেল মেয়েটা বাড়িতে আসেনি। আমি যে কি চিন্তায় নিয়ে দিন কাটাই, সে আমিই জানি।'

ডক্টর আহমেদ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এইজন্যেই মাঝে-মাঝে মনে হয়, শহরের লোকেরা যে পরিবার-টরিবারের পাট চুকিয়ে দিয়েছে, সেটা একদিক দিয়ে ভালই করেছে। এই আমাদের মতন কিছু গ্রাম্য লোক এখনও বর-বউ, ছেলেমেয়ে এইসব মায়ার বন্ধন তৈরি করি আর বেকার কষ্ট পাই।'

বাকি দুজনের মধ্যে কেউই ওঁর কথার উত্তর দিল না। দুজনেই বুঝতে পারছিল, ডক্টর আহমেদের মুখ দিয়ে আসলে কথা বলছেন চিন্তিত এক পিতা, কন্যাটি যাঁর প্রাণ। সেন্ডুপ ভুটিয়া ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ডক্টর আহমেদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেন্ডুপ দেখলেন এই সময়ে যতটা অন্ধকার হওয়ার কথা, তার চেয়েও বেশি অন্ধকারে ঢেকে আছে আকাশের মুখ। বৃক্ষহীন পৃথিবীতে এখন কদাচিৎ মেঘ জমে। আজ সেরকমই এক বিরল সন্ধ্যা। কখন যেন সমুদ্রের দিক থেকে রাশি-রাশি মেঘ এসে মাথার ওপরটা ভরিয়ে তুলেছে। সেই মেঘের রং শুকিয়ে যাওয়া রক্তের মতন কালচে লাল ।

সেন্ডুপের ভুরুতে চুল প্রায় নেই বললেই চলে, তবু সেই ন্যাড়া ভুরুদুটোই কুঁচকে উঠল। সে জানে, মেঘ জমা মানেই ঝড় আসা। আজকাল ঝড় আসে ঘনঘন। মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। তার সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যায় আরও কিছুটা উর্বর মাটির আস্তরণ। একদিন ঝোপঝাড় গাছপালা আর ঘাসের শেকড় মাটিকে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখত। সেই বাঁধন আর নেই, তাই প্রতিটি ঝড়ের পরে মাতা ধরিত্রীর বুকের মাংস উঠে গিয়ে আরও কিছুটা কাঁকর-নুড়ির কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ে ।

আরও কিছুটা চাষের জমি বন্ধ্যা হয়ে যায়

বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, সব বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে মাটি। বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে নারী।

কালিমোনাল গ্রামের কিছু পরিবারে এখনও বিপদে আপদে স্তোত্রগানের রীতি আছে । কত হাজার বছর আগে রচিত সেইসব স্তোত্রের কিছু-কিছু সেন্ডুপ ভুটিয়ার স্মৃতিতেও ধরা আছে বইকি। সে মাঝে-মাঝে নিজের মনেই বিড়বিড় করে ওরকম স্তোত্র আবৃত্তি করে। না, কোন দৈব অনুগ্রহের আশা তার নেই। সে স্তোত্রগুলো আবৃত্তি করে আর অবাক হয়ে নিজেই কান পেতে নিজের আবৃত্তি শোনে। শোনে আর ভাবে, এতরকমের ফুল-লতা-পাতাও এককালে ছিল এই পৃথিবীতে! এত নদী ছিল, এত হ্রদ, এত তুষারশৃঙ্গ! প্রাণের এত প্রকাশ ছিল পৃথিবীর বুকে !

কোথায় গেল? কোথায় হারিয়ে গেল সেই সব প্রাণ? নিজের মনেই বলে উঠল সেন্ডুপ।

ত্রিশ বছর আগেও চাষের কাজের পাশাপাশি সেন্ডুপ ভুটিয়ার একটা ব্যবসা ছিল। তার বয়স তখন চল্লিশের কোঠায়। তার স্ত্রী জিনার বয়সও চল্লিশের নীচে। ওরা স্বামী-স্ত্রী মিলে বেবি-কট বানাতো। গাছপালা অবশ্য তখনও তেমন ছিল না, কিন্তু কাঠ ছিল অনেক। বহু প্রাচীন সব গাছের কঙ্কাল এই কালিমোনাল গ্রামের আশেপাশেই ধুলোবালির নীচে চাপা পড়েছিল, এখনও রয়েছে। সেই সব পুরনো কাঠের টুকরো থেকে সদ্যোজাতদের জন্যে খুদে খাট বানাতো। কাঠের পুতুলও বানাতো। ওদের দুই ছেলেমেয়ে, টিনা আর রকি, ওরা তখনও টিন-এজার, ওরা সেই পুতুলগুলোকে দারুণ উজ্জ্বল সব রঙে রাঙিয়ে দিত।

ত্রিশ বছর আগে প্রসূতিসদনগুলোও ভালই চলত। এই পাহাড়ের কোলে যে দশ-বারোটা গ্রাম রয়েছে, তাদের সমস্ত প্রসূতির জন্যে একটি প্রসূতিসদন ছিল। ওখানেই ছিল তার বেবি-কট আর খেলনার দোকান। নতুন বাবা-মায়েরা পুতুলের মতন বাচ্চাগুলোকে বাড়ি নিয়ে যাবার সময় একসঙ্গেই তাদের জন্যে খাট আর পুতুলও কিনে নিয়ে যেত।

সুখের দিন ছিল তখন। এখনও মাঝে-মাঝে স্রেফ সময় কাটাবার জন্যে ঘরের দাওয়ায় বসে ছুরি আর বাটালি দিয়ে কুদে-কুদে অন্যমনস্কভাবে একেকটা পুতুল বানিয়ে ফেলে সেন্ডুপ। পুরনো দিনের কথা ভাবতে-ভাবতে একটা ঘোরের মধ্যে কাঠের টুকরোর গা থাকে চোকলার পর চোকলা কেটে ফেলে।

তারপর হঠাৎ একটা সময়ে নিজের হাতে ধরে থাকা পুতুলটার দিকে তাকিয়ে তার গা শিরশির করে ওঠে। এ কী বানিয়েছে সে? এত বীভৎস কোনও মানুষের মুখ কি সে বাস্তবে দেখেছে কখনও? কিংবা

এরকম একটা হিংস্র জলদানব? এই হাত দিয়েই কি সে একদিন পরির পুতুল বানাতো? বানাতো বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নভোচারীর মূর্তি?

পাকদণ্ডী পথের একটা বাঁক ঘুরতেই পেছনে হারিয়ে গেল ডক্টর আহমেদের বাড়ি। অন্ধকার আরও একটু ঘন হয়ে এল। চড়বড় করে সেন্ডুপ ভুটিয়ার গায়ে বড় বড় কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা ঝড়ে পড়ল। ফুটন্ত জলের মতন গরম বৃষ্টির জল। যেখানে-যেখানে পড়ল, মনে হল গায়ের চামড়া যেন পুড়ে গেল। এখনও সেন্ডুপের নিজের বাড়ি বেশ কিছুটা দূরে। সে আশেপাশে তাকালো যদি পাহাড়ের গায়ে কোনো একটা খাঁজ-টাজ দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পারে। সেরকম একটা পাথরের আড়াল সে দেখত পেল ঠিকই, কিন্তু তার নীচে যা দেখল, তাতে সেন্তুপের পা-দুটোও কিছুক্ষণের জন্যে জমে পাথর হয়ে গেল ।

সে দেখল পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা ওই পাথুরে কার্নিশটার নীচেই দাঁড়িয়ে আছে ফুটফুটে একটা মেয়ে। পিঠের ব্যাগ, চুলের পনিটেল আর স্কুল-ইউনিফর্ম সব মিলিয়ে নিখুঁত একটি ক্লাস-ওয়ান কিংবা নার্সারি-ক্লাসের বাচ্চা।

অন্ধকারের মধ্যেও মেয়েটার গাঢ়-নীল স্কার্টের নীচে বেরিয়ে-থাকা ফরসা দুটো পা আর দুধসাদা ব্লাউজটা যেন স্নিগ্ধ একটা আলো ছড়াচ্ছিল।

কতই বা বয়স হবে মেয়েটার? পাঁচ কি বড়জোর ছয়। এইটা দেখেই সেন্ডুপ অবাক হয়েছিল। ভীষণ অবাক। পাঁচ বছরের বাচ্চা এই রাস্তায় এল কোথা থেকে। সেতো জানে, সারা পৃথিবীতেই গত বারো বছরে একটিও বাচ্চা জন্মায়নি। আর পৃথিবীর কথা থাক, এই পাহাড়ি গ্রামগুলোতে যে গত বারো বছরে কোনও বাচ্চা জন্মায়নি সে নিজেই তার সাক্ষী। তাহলে এই খুকিটা এল কোথা থেকে?

সেন্ডুপের চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটা খুব মিষ্টি হেসে বলল, 'তোমার কি মনখারাপ?'

সেন্ডুপ বলল, 'হোয়াই আর ইউ আস্কিং ?'

'এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না?'

সেন্ডুপ ভেবে দেখল, সত্যিই ইচ্ছে করছে না। এই যে সে বাড়ি ফিরছে, কার কাছে ফিরছে?

বিষাদের ঘন চাদরে মুখ ঢেকে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকে তার স্ত্রী। অনেকবার ডাকাডাকি করলে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায়। চোখে অবোধ চাউনি। যেন এই দুনিয়ার কিছুই বুঝতে পারছে না। সত্যিই পারে না।

ছেলে-মেয়েদুটো সেই যে কতবছর আগে তিন-শহরের দিকে চলে গেল, তারা আর ফিরল না। সেন্ডুপ অনেকবার ওদের বারণ করেছিল যেতে। বলেছিল, একটুকরো জমির ওপরে মাত্র সাত লক্ষ মানুষের বসবাস, তবু সেই সাত লক্ষ মানুষের মধ্যে ভাষা আর চেহারা অনুযায়ী এখনও সাত-রকমের গোষ্ঠী। গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সারাক্ষণ চোরাগোপ্তা মারপিট। বলেছিল, তোদের মতন চেহারা খুব কম মানুষেরই রয়েছে রে। তোরা সবার হাতে মার খাবি । তাই খেয়েছে নিশ্চয়ই। মার খেয়ে মরে গেছে। নাহলে এতবছরের মধ্যে একবারও বাড়ি না ফেরে।

তাহলে আর কী বাকি থাকে সেন্ডুপের? কাঠের পুতুল? সেও তো হারিয়ে গেছে। পুতুলকে সরিয়ে দিয়ে, তার মনের মধ্যে বাসা বেধেছে জলদানব আর রাক্ষস। সেকি এখন বাড়ি ফিরে বাটালি দিয়ে টুকটুক করে রাক্ষসের মুখ বানাবে?

উত্তপ্ত জলের বৃষ্টি আরও চেপে নামল। এখন বোঝা যাচ্ছে না। কাল সকালে দেখা যাবে যেখানে যেখানে এই বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছে, সেখানে-সেখানে চামড়া উঠে গেছে।

দ্রুত পা চালিয়ে সেন্ডুপ পাথরের কার্নিশটার নীচে, বাচ্চা মেয়েটার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

গাছপালা আর কলকারখানা অবলুপ্ত হওয়ার ফলে পৃথিবীতে এখন গন্ধের খুব অভাব; সে সুগন্ধই হোক কিংবা দুর্গন্ধ। ফুলের গন্ধই হোক কিংবা পোড়া পেট্রলের গন্ধ। তাই যে-কোনও নতুন গন্ধেই এখন মানুষের

নাক চট করে সচেতন হয়ে ওঠে। মেয়েটার ভিজে স্কার্ট আর খোলা চুল থেকে সেন্ডুপ একটা অস্বস্তিকর গন্ধ পেল, যেটা ঠিক শিশুর গায়ের গন্ধ নয়। কিন্তু সেদিকে বেশিক্ষণ মন দিতে পারল না, কারণ, মেয়েটা তখনও তার প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় বড়-বড় চোখদুটো তুলে সেন্ডুপের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সেন্ডুপ একটু ইতস্তত করে বলল, 'জানি না তুমি কেমন করে বুঝলে। সত্যিই আমার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না।'

মেয়েটা বলল, 'তাহলে ফিরো না বাড়িতে। আমার সঙ্গে চলো।' 'কোথায়?' যতটা অবাক হওয়ার কথা ছিল, ততটা অবাক হতে পারল না সেন্ডুপ ভুটিয়া। বাচ্চা মেয়েটা তাকে অনেক কথাই ভুলিয়ে দিচ্ছিল যেন। তবু জোর করেই সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব?'

মেয়েটা বলল, 'আমাদের স্কুলে। নাটাবাড়ি নার্সারিতে।'

৩

একটা সরু খাড়ি যেখানে স্থলভূমির মধ্যে ঢুকে এসেছে, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রাচীন ওয়াটার-ট্রিটমেন্ট-প্ল্যান্টটা। যেটা প্রায় পাঁচশো বছর আগে তৈরি, যখন হিউম্যান সিভিলাইজেশন তার শিখরে ছুঁয়েছিল; যখন মানুষের মহাকাশযান গ্রহ থেকে গ্রহে ঘুরে বেড়াত। এলিয়েনরাও আসত এই পৃথিবীতে বাণিজ্য করতে।

এই প্ল্যান্টের আলিশান চত্বর জুড়ে ছড়ানো রয়েছে অজস্র শিরা-উপশিরা আর জালিকার মতন পাইপলাইন। সেই সমস্ত পাইপলাইন ক্রমান্বয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা, তার সঙ্গে আরও একটা, এইভাবে জুড়তে জুড়তে শেষ অবধি দুটো বিশাল পাইপে গিয়ে মিশেছে। পাইপদুটো তারপর ঢুকে গেছে দানবের কিডনির মতন দেখতে দুটো সেরামিকের ট্যাঙ্কের মধ্যে।

ট্যাঙ্কদুটোর কাজও অনেকটা কিডনির মতোই। সমুদ্রের নোনা জলকে ছেঁকে পরিশ্রুত করে স্নান-পানের উপযোগী করে তোলাই ওদের কাজ। অর্থাৎ এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কেন্দ্রবিন্দু ওই দুটি যান্ত্রিক কিডনি।

রাত নটা নাগাদ বাঁদিকের কিডনিটার নীচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল স্ট্যানলি। তার হাতের ক্যানভাসের ব্যাগটার মধ্যে থেকে উঁকি মারছিল প্লাম্বারদের রুটিন কিছু যন্ত্রপাতি। এই যেমন, স্প্যানার, রেঞ্চ, মেগাসাইজের স্ক্রু-ড্রাইভার এইসব।

এককালে-যে প্ল্যান্টের এই উঠোন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করত সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই, কারণ, সেই সুদিনের সাক্ষী হয়ে এখনও সার সার বাতিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে তাদের কারুর মাথাতেই আর বাতি জ্বলে না। সাত-আটটা বাল্ব বাদে আর সব ফিউজ হয়ে গেছে। একবার ফিউজ আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে থুঃ করে থুতু ফেললো স্ট্যানলি । ভাগ্যিস পোর্টেবল ফ্ল্যাশলাইটগুলো এখনও কাজ করছে, নাহলে শুধু আলোর অভাবে নাইট-শিফট বন্ধ হয়ে যেত। যাবেও নিশ্চয়, আজ না হলে কাল ।

হাতের ক্যানভাস ব্যাগটা থেকে ফেঁসো কাপড়ের একটা নুটি বার করে তাই দিয়ে ঘষে ঘষে হাত ঘাড় গলা কপাল থেকে যতটা পারে তেল-কালি সাফ করল স্ট্যানলি । তারপর চাতালের একদিকে পা ঝুলিয়ে বসে টিউনিকের পকেট থেকে একটা আরকের বোতল বার করে গলায় এক ঢোক ঢালল। অন্য পকেট থেকে বার করল টিস্যু পেপারে মোড়া একটা জাম্বো সাইজের ফিস-রোল ।

শুকনো মাছ নয়, তাজা টুনা মাছের স্লাইস ভরা থাকে এই রোলগুলোতে। তাছাড়াও পাহাড়ি-গ্রাম থেকে জোগাড় করে আনা দুর্লভ এবং দুর্মূল্য লেটুস পাতা আর বীটের টুকরো। এইসবই প্ল্যান্টের কর্মচারীদের স্ট্যান্ডার্ড প্রভিসন সাত লক্ষ মানুষের মধ্যে বড়জোর সাতশো নারী-পুরুষ এরকম টাটকা আটার রুটি, সবজি, তাজা মাছ ইত্যাদি খেতে পায়। শুধুমাত্র সেই সাতশো জন, যারা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, সোলার এনার্জি প্ল্যান্ট, ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যালগি ইউনিট কিংবা রেশনিং-ডিপার্টমেন্টে চাকরি করছে। কলোনির নোংরা পরিষ্কার করার কাজ যারা করে, তারাও পায়। তার বাইরে আর কেউই পায় না।

অসম্ভব খিদে নিয়ে দু-কামড়ে রোলটার অর্ধেকটা শেষ করে ফেলল স্ট্যানলি। তারপর আসমানির কথা মনে পড়ল। আর খেতে পারল না । বাকি রোলটা আবার টিউনিকের পকেটে ঢুকিয়ে, হাত-টাত ধুয়ে ফিরে গেল কিডনির নীচে, বাকি কাজটুকু শেষ করতে।

স্ট্যানলিরা সাত-পুরুষের প্লাম্বার। দুশো উননব্বই বছর আগে যুদ্ধের সময় তার পূর্বপুরুষেরা সৈনিক হিসেবে নয়, সেনাবাহিনীর মেকানিকাল-ডিভিশনের কর্মচারী হিসেবেই এই দেশে এসেছিল। তারপর তাদের আর ফেরা হয়নি। এখানে যারা কাজ করে তারা প্রায় সকলেই বাপ-দাদাদের কাছ থেকেই কাজ শিখেছে। তাছাড়া আর কোথায়ই বা শিখবে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ টলেজ তো আর নেই।

সেই স্প্যানার ঘোরানো বিদ্যে দিয়ে স্ট্যানলি এই প্ল্যান্টের সবটা বুঝতে পারে না। সত্যি বলতে কি কিছুই প্রায় বুঝতে পারে না। এখানে একটা ভাঙা পাইপ বদলানো, ওখানে একটা সকেটকে টাইট দেওয়া, এর বাইরে আর বিশেষ কিছু কাজ নেই তার।

কারুরই নেই। কেউই বোঝে না এই প্ল্যান্টের কর্মপদ্ধতি।

তাহলে প্ল্যান্টটা চলছে কেমন করে? চলছে নিজের ইচ্ছেয়।

হ্যাঁ। সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট হোক, অ্যালগী-সেন্টার হোক কিংবা এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ; প্রতিটি কারখানার প্রতিটি মেশিনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে একটা চেতন-অংশ, একটা বুদ্ধিমান সত্তা, যাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যার উপস্থিতি তারা প্রত্যেকে বুঝতে পারে।

এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা যায় মানুষের দেহের ভিতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর। হার্ট, কিডনি, লাংস, লিভার। সেগুলোও যেমন একাধারে একটা করে জটিল যন্ত্র আবার জীবন্ত কিছু কোষকলার সমষ্টি, এরাও তাই।

যেমন গত সাত বছর এই প্ল্যান্টে কাজ করতে-করতে বহুবার স্ট্যানলি দেখেছে, কিডনি শেপের ট্যাঙ্কের মধ্যে ফিল্টারগুলো নিজেরাই নিজেদের রিপ্লেস করছে। নুনে কঠিন হয়ে আসা পুরনো মেমব্রেনগুলোকে যেন শুষে নিচ্ছে ট্যাঙ্কের সেরামিকের দেয়াল । তাদের বদলে কোথা থেকে আবার গজিয়ে উঠছে ঝকঝকে গোলাপি নতুন মেমব্রেনের স্তর। খুব সিনিয়র সহকর্মীদের জিজ্ঞেস করে দেখেছে স্ট্যানলি, তারাও জানে না এসব কেমন করে হচ্ছে। স্ট্যানলির প্রশ্নে তারা বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'তোমাকে অত ভাবতে কে বলেছে হে ছোকরা? নিজের বল্টু টাইট দেওয়ার কাজটুকু করে যাও না।'

তাই করে যাচ্ছে স্ট্যানলি। তবে ভাবনাকে তো আর আটকানো যায় না। ভাবাই তার স্বভাব। তাই সে কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে পুরো প্ল্যান্টটার দিকে আর ভাবে, তেলকালির গন্ধের বদলে কেন এই প্ল্যান্টে ঘামের গন্ধ বাতাসে ঘোরে? কারা, কীভাবে বানিয়েছিল এই আপাত সরল অথচ ভীষণ জটিল সিস্টেমটাকে?

এই শেষ প্রশ্নের উত্তরটা অবশ্য মাত্র কয়েকদিন আগেই স্ট্যানলি পেয়ে গেছে।

সেদিন তার ওপরে প্ল্যান্টের কিছুটা জায়গায় জমে থাকা মরচের স্তরকে অ্যাসিড দিয়ে পরিষ্কার করার ভার পড়েছিল। অ্যাসিডের ঘষায় হঠাৎই একটা তামার ফলকের ওপরে কিছু লেখা ভেসে উঠেছিল, যেখান থেকে স্ট্যানলি জানতে পেরেছিল এই প্ল্যান্ট তৈরি করেছিল অন্য এক গ্রহের উন্নত প্রাণীরা ।

আরও একটা জিনিস ওই ফলকেই লেখা ছিল। সেটার কথা স্ট্যানলি কাউকে বলেনি। তার মনে হয়েছিল, কথাটা পাচকান হওয়া উচিত হবে না। লেখা ছিল, এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের উদ্বোধনের মাধ্যমে মহান মস্তিষ্কের সাথে পৃথিবীকে যুক্ত করার যে প্রকল্প তার সূচনা হল।

মহান মস্তিষ্ক! স্ট্যানলি অনেকক্ষণ উবু হয়ে বসে ছিল ওই তামার ফলকটার পাশে। অ্যাসিডের ধোঁয়া কিছুটা তার নাকে-মুখে ঢুকছিল ঠিকই, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল ছিল না। সে ভাবছিল, মহান মস্তিষ্ক মানে কী? এটা কি রূপক? উপমা? আসলে কি মস্তিষ্কের মতন জটিল কোনও যন্ত্রগণকের কথাই বলতে চেয়েছিলেন সেদিনের পুরসভার কর্মকর্তারা? নাকি তারা সাইবর্গের মতন কোনও কিছুকে বোঝাতে

চেয়েছিলেন? ‘সাইবর্গ’, মানে যেখানে জীবন্ত প্রাণীর দেহাংশ আর মেশিন মিলিয়ে তৈরি করা হয় একটা টোটাল সিস্টেম।

এই প্ল্যান্টটাও কি তাই? সাইবর্গ? সেইজন্যেই কি জীবন্ত কোষের মতন এর বহু অংশ নিজে থেকে গড়ে ওঠে, শুকিয়ে খসে পড়ে, আবার গজায়? না কি যন্ত্রগণকও নয়, সাইবর্গও নয়। মহান মস্তিষ্ক এসবের উর্ধ্বে আরও অন্য কিছু?

এই শেষ চিন্তাটা তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে আসমানি নামে ওই মেয়েটা । ডিউটি শেষ করে স্ট্যানলি বাড়ি ফেরার জন্যে ওয়াটার-প্ল্যান্টের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে রাস্তায় নামল। প্ল্যান্টের বিশাল উঁচু বাউন্ডারি ওয়াল বরাবর যে রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে পনেরো মিনিট হাঁটলে তবে ওর কোয়ার্টারে পৌঁছনো যায়।

পুরো রাস্তাটাই সন্ধের পর থেকে অন্ধকারে ঢাকা থাকে। এখানে কিছু গাছও আছে। গাছগুলোর জন্যেই জায়গাটা আরও অন্ধকার হয়ে থাকে ।

সাতদিন আগে, সেদিনও ডিউটি শেষ করে এরকমই রাত বারোটা নাগাদ সেই রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিল স্ট্যানলি। হঠাৎই সে একটা কাতরোক্তি শুনতে পায়; কোনও মেয়ের গলা। ছুটে গিয়ে দেখে, যা ভেবেছে তাই। একটা মেয়েকে রেপ করার জন্যে টানতে-টানতে গাছের আড়ালে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকটা ভ্যাগাবন্ড ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে সবচেয়ে বড় স্প্যানারটা বার করে, ওই রেপিস্টগুলোর ওপরে লাফিয়ে পড়েছিল স্ট্যানলি। স্প্যানারের দু-চারটে কোঁৎকা ঘাড়ে পিঠে পড়তেই শালারা বাপ-বাপ বলে দৌড় দিয়েছিল।

মেয়েটাকে সেদিন নিজের কোয়ার্টারেই নিয়ে এসেছিল স্ট্যানলি। ওই মেয়েটাই আসমানি ।

আসমানি মেয়েটাকে বেশ লাগছে স্ট্যানলির। ওর সমবয়সিই হবে মেয়েটা, মানে ত্রিশের আশেপাশে। লম্বাটে গড়ন, কাটা কাটা নাক মুখ। বড় বড় দুটো চোখের মণিতে সামান্য খয়েরি আভা। কিন্তু ওসব চেহারা-টেহারা কিছু নয়। মেয়েটা স্ট্যানলিকে টানছে ওর কথার জন্যে। যতক্ষণ স্ট্যানলি সামনে থাকে, আসমানি অনর্গল কথা বলে যায় ওর সঙ্গে। আসমানির কথার বিষয় দুটো। এক, কালিমোনাল নামে এক পাহাড়ি গ্রামে ওর ঘরবাড়ির গল্প, ওর বাবা-মার কথা। আজন্ম কলোনিতে বসবাস করা ছেলে স্ট্যানলি হা করে সেই গল্পগুলো শোনে। এর আগে ও গ্রামের কোনও মানুষকে দেখেনি। বাবা মা, প্রতিবেশী এই ব্যাপারগুলোও ওর কাছে নতুন। শুনতে শুনতে মনের মধ্যে ভারী এক আরাম ছড়িয়ে পড়ে স্ট্যানলির। তার মনে হয়, আমারও যদি এরকম একটা পরিবার থাকত বেশ হত। বউ, ছেলে,

মেয়ে। তারপরেই অবশ্য ঘোর কেটে যায়। ভাবে, আমার কি আর আসমানিদের মতন নিজেদের খাবার নিজের জোগাড় করার ক্ষমতা আছে? আজ খেতে পাচ্ছি। কাল যদি উপবাসে থাকতে হয়? একা উপোস করা যায়। ছেলে-মেয়েকে খিদের জ্বালায় কাঁদতে দেখা তো খুব কষ্টের। দরকার নেই বাবা। একা ভাল আছি।

স্ট্যানলি মন দিয়ে শোনে ওদের চাষবাসের কথা। ওর মা আর বাবা যে শুধু আশেপাশের গাছপালার নির্যাস থেকেই এতরকমের ওষুধ, মদ, এমনকি মোমবাতি আর সাবান অবধি বানিয়ে ফেলতে পারেন, তা শুনে ভারি আশ্চর্য হয় স্ট্যানলি।

আসমানির অন্য ধরনের কথাগুলো সবই ওর ঘোরাঘুরি সংক্রান্ত স্ট্যানলি বেশ বুঝতে পারে, মেয়েটা একটু পাগল আছে। নাহলে কেউ জ্ঞানের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়?

ওর নানান জায়গা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া টুকরো-টাকরা জ্ঞানের কথাগুলো স্ট্যানলি ভাল করে বুঝতে পারে না। সে বুঝতে পারে না বলে আসমানি

রেগে যায়। বলে, ‘তুমি বুঝবার চেষ্টা করছ না।'

‘না গো’। স্ট্যানলি প্রতিবাদ করে। ‘আসলে তুমি তোমার শিক্ষিত বাবা-মায়ের কাছ থেকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠটুকু পেয়েছ, আমি তো তা পাইনি। আমি তো মানুষ হয়েছি সরকারি হোমে। সেখানে

অতকিছু শেখায় না। সেইজন্যেই কঠিন লাগছে। সেইজন্যেই এতবার তোমাকে কথার মধ্যে থামিয়ে দিয়ে এটা-ওটা প্রশ্ন করছি। তুমি রাগ করছ?'

আসমানি লজ্জা পায়। বলে, 'না না। রাগ করিনি। তুমি যেটাই বুঝতে পারবে না, আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী জানো তো? আমিও নিজেও সারাক্ষণ খুব ঘেঁটে থাকি। চারিদিকে যাই দেখি, মনে প্রশ্ন জাগে, এর উৎস কী? কবে? কোথায়? কাদের হাতে? আকাশ থেকে তো আর কিছুই নেমে আসেনি আমাদের কাছে। ধরো ধরো এই যে দেয়ালের ইট। কারা প্রথম মাটি পুড়িয়ে ইট বানিয়েছিল? এই যে আগুন, কারা প্রথম আগুন জ্বেলেছিল? কারা বানিয়েছিল প্রিন্টেড সার্কিট, কতবছর আগে? তার আগে কীভাবে ডাটা স্টোর করা হত?" কথার খেই হারিয়ে চুপ করে যায় আসমানি ।

স্ট্যানলি চিন্তিত মুখে বলে, 'তাই তো। আমি তো কোনওদিন ভাবিইনি এসব নিয়ে। আচ্ছা, এই যে উৎসের সন্ধান, একে যেন কী বলে? কী যেন একটা টার্ম তুমি কাল ইউজ করেছিলে?'

'ইতিহাস?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইতিহাস। তাহলে কি আমাদের ইতিহাস হারিয়ে গেছে আর তুমি সেই ইতিহাস খুঁজে বেড়াচ্ছ?'

আসমানি কুণ্ঠিত মুখে বলে, 'হ্যাঁ, স্ট্যানলি। তবে শুধু চারিদিকের জড়বস্তুর ইতিহাসই যে খুঁজছি তা নয়। প্রাণেরও তো একটা ইতিহাস আছে। এই যে পোকামাকড়, মাছ, গাছপালা; আজ যারা হারিয়ে গেছে কিন্তু একদিন যারা পৃথিবীতে ছিল, যাদের কথা সেন্ডুপ আঙ্কলদের স্তোত্রে ধরা আছে; তাদেরও তো ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসটা অবশ্য অনেকটাই আমার বাবার জানা । তার সঙ্গে এখনকার পৃথিবীটাকে মিলিয়ে নিতে চাইছি। সেটাও আমার আরেকটা নেশা। তোমাকে বলব সব আস্তে-আস্তে, যদি সময় পাই।'

স্ট্যানলি সচকিত হয়ে ওঠে। বলে, 'যদি সময় পাই মানে কী? কেন সময় পাবে না?"

আসমানি অন্যমনস্কভাবে বলে, 'আসলে আমি কোথাও একটানা বেশিদিন থাকতে পারি না। বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। তাই বলছিলাম।'

'ও'। এর বেশি কিছু আর সেদিন বলতে পারেনি স্ট্যানলি ।

আজও সে বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের কোয়ার্টারের দরজায় নক করল। ভিতর থেকে দরজা খুলে দিল আসমানি ।

প্রতিদিন এই দরজা খোলার মুহূর্তটায় স্ট্যানলি কেমন যেন অসাড় হয়ে যায়। জীবনে এই প্রথম কেউ তাকে ভিতর থেকে দরজা খুলে দিচ্ছে। তাকে তালা খুলে ঘরে ঢুকতে হচ্ছে না। এই প্রথম কেউ রাত বারোটাতেও তার জন্যে আলো জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছে, সে ঘরে ঢুকতেই খুশি হয়ে উঠছে। এইসবই তাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে তোলে। ঘোর কাটাতে কিছুটা সময় লাগে স্ট্যানলির।

তারপর আসমানি তার হাতে ছোট্ট একটা টান মেরে তাকে ঘরে ঢোকায়। বলে, 'তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় চেঞ্জ করে আমার সামনে এসে বোসো। সারাদিন কথা বলার লোক পাইনি, অথচ সাঙ্ঘাতিক একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় এসেছে। আচ্ছা, তুমি কি জানো, গত বারোবছরের মধ্যে পৃথিবীতে কোনও নতুন শিশু জন্মায়নি। বলেছিলাম তো তোমাকে, যে কারণে আমার বাবা, আমার সেন্ডুপ আঙ্কল সবাই বেকার হয়ে গেছে এবং খুব দুঃখে আছে।'

স্ট্যানলি হেসে ফেলে। আসমানি একদিকে ওকে হাত পা ধোয়ার কথা বলছে আবার অন্যদিকে নিজের কথার তোড়-কে থামিয়ে রাখতে পারছে না। সে ওভারঅলের বোতামগুলো খুলতে খুলতে বলে, 'হ্যাঁ, বলেছিলে। তাছাড়া আমাদের কলোনির সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনটাতেও এই নিয়ে একটা ছোট আর্টিকল চোখে পড়েছিল। আরে! এটা আবার কী?" ওভারঅলের পকেটটা একটু উঁচু হয়ে ছিল। সেখানে হাত ঢুকিয়ে স্ট্যানলি টিস্যু পেপারের মোড়কটা বার করে আনল। আসমানির দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'কিরকম ভুলো মন হয়েছে দেখো, এটা যে এনেছিলাম, সেটাই ভুলে গিয়েছিলাম । নাও, খেয়ে নাও চট করে।

আসমানি কাগজে মোড়া আধখানা রোল হাতে নিয়ে বলল, 'কী এটা?” ‘আজ আমাদের ডিনারে দিয়েছিল। খেতে গিয়ে মনে হল যাগগে, চট করে খেয়ে নাও।'

ততক্ষণে আসমানি টিস্যু পেপারের মোড়কটা খুলে ফেলেছে। রোলের গন্ধে তার নাকের পাটা ফুলে উঠল। তারপরেই সে গোগ্রাসে খেতে শুরু করে দিল ওই অবশিষ্ট রোলটুকু।

ওর খাওয়া দেখতে-দেখতে স্ট্যানলির চোখদুটো ঝাপসা হয়ে গেল। কতদিন টাটকা স্বাদু কোনও খাবার খেতে না পেলে একজন মানুষ এইভাবে খাবারের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে খেতে পারে? কতদিন পেট ভরে খেতে না পেলে একটা মেয়ের কলার-বোনদুটো এইভাবে ঠেলে উঠতে পারে? কতটা পুষ্টির অভাবে এইভাবে সারা মুখে ফুটে উঠতে পারে মেচেতার দাগ?

এসব নিয়ে আগে কখনও ভাবেনি সে। স্ট্যানলির অভ্যেস রাস্তায় মুখ নীচু করে হাঁটা। এ যে ওর একার অভ্যেস তা নয়, এই কলোনির জীবনে কেউ কারুর মুখের দিকে তাকাতে চায় না, চোখে চোখ রাখতে চায় না। কেউ দেখতে চায় না পথচলতি মানুষের চোখ চোখে জমে থাকা গাঢ় অবসাদ আর আত্মহত্যাপ্রবণতা। ওই জিনিসগুলো সংক্রামক, সবাই জানে। শুধু কখনও কারুর মনে কামেচ্ছা জাগলে সে মুখ তুলে অন্য কারুর চোখে সেই ইচ্ছার প্রতিফলন খোঁজে। তাছাড়া যে যার মতন মাথা নীচু করে হেঁটে যায়।

কিন্তু আজ তার নিজের ঘরে, তার থেকে ঠিক একহাত দূরে দাঁড়িয়ে যে-মেয়েটি জিভ দিয়ে কাগজ থেকে সস চেটে নিচ্ছে, তাকে কেমন করে না দেখে পারে স্ট্যানলি?

সে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, ‘ভাল লাগল? পেট ভরল না বোধহয়, তাই না?”

আসমানি স্ট্যানলির গলার আওয়াজে হুঁশে ফিরল। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে বলল, ‘ভরেছে’।

তারপরে হঠাৎই স্ট্যানলির দিকে এগিয়ে এসে ওকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে, ওর খোলা বুকে, গলায়, গালে, ঠোঁটে সর্বত্র নিজের ঠোঁটদুটো ঘষতে শুরু করল। স্ট্যানলির কানের লতিটা দাঁতের আলতো কামড়ে ধরে রেখে, দাঁতের ফাঁক দিয়েই ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে একটু আদর করবে? হুঁ? করবে একটু আদর ?'

আসমানির ভগদেশের কোমলতা এবং উত্তাপ স্ট্যানলির পুরু কর্ডের ট্রাউজার ভেদ করে ওর পুরুষাঙ্গকে তাতিয়ে তুলল। বহুদিন পরে এমন বিপুল লিঙ্গোত্থান হল স্ট্যানলির। সাতদিনের মধ্যে সেদিনই প্রথম ওরা দুজনে মিলিত হল। পান্থপাদপের নরম কাণ্ডে আঙুল ঢুকিয়ে দিলে যেভাবে গলগল করে জল বেরিয়ে আসে, সেইভাবেই স্ট্যানলির পুরুষাঙ্গ ভিতরে ঢোকামাত্রই আসমানির যোনি থেকেও ফিনকি দিয়ে জল বেরিয়ে এল।

রাগমোচনের পরে ওরা শিথিল শরীরে এ-ওকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল। স্ট্যানলি হঠাৎ খেয়াল করল, আসমানি ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ?’

আসমানি উত্তর দিল, ‘আমার খুব ভাল লেগেছে। তোমার?' কথাগুলো কিছুটা অসংলগ্ন লাগল স্ট্যানলির কানে। ভাল লাগার সঙ্গে ভাবনার সম্পর্ক কী? তবুও সে বলল, ‘আমারও। কিন্তু কী ভাবছ বললে না তো।'

‘এটাই’, বলল আসমানি। তারপর হঠাৎই উপুড় হয়ে স্ট্যানলির বুকের ওপরে মাথা রেখে শুয়ে, মুখটা নিয়ে গেল স্ট্যানলির মুখের কাছে। বলল, ‘যৌনসুখ জিনিসটা আসলে প্রকৃতির দেওয়া ঘুষ, জানো তো? প্রকৃতি চায় আমাদের জিন পরের প্রজন্মে প্রবাহিত হোক। আমরা সঙ্গম না করলে তো প্রকৃতির সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সন্তানই হবে না আমাদের। কিন্তু আমরা বুদ্ধিমান জীব, শুধুমুধু সঙ্গম করবই বা কেন, যদি পরিবর্তে কিছু না পাই। পরিবর্তে যা পাই, সেটার নামই অর্গাজম।'

স্ট্যানলি বলল, 'হ্যাঁ, সেটা কিছুটা বুঝতে পারি। কিন্তু এটা নিয়ে ভাবার কী আছে?'

‘ষোলো বছর বয়সে আমাদের কালিমোনাল গ্রামের এক কিশোরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। সেই প্রথম। তারপরে গত চোদ্দো বছরে আরও অজস্রবার সঙ্গত হয়েছি। কখনও সেই মিলনের মধ্যে ভালবাসা ছিল,

কখনো ছিল না। কিন্তু যেহেতু প্রতিবারই নিজের ইচ্ছায়, নিজের তৃষ্ণা নিয়ে মিলিত হয়েছি, যেহেতু প্রতিবারই আমার শরীর প্রস্তুত ছিল তাই চরমসুখ পাইনি এরকম হয়েছে খুব কম।'

স্ট্যানলি মুচকি হেসে বলল, 'সেও তো খুব আনন্দের কথা। তাই নিয়েই বা চিন্তা কিসের?'

আসমানি বলল, 'চিন্তা এটাই যে, গত বারো বছর ধরে দেখছি, ক্রমশ আমার শরীরের আনন্দের বিন্দুগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। ষোলো বছর বয়সে যদি কোনও পুরুষ আমার ঘাড়ের পেছনে একটা চুম খেতো, তাহলেও আমার সমস্ত স্নায়ু ঝনঝন করে বেজে উঠত। কুড়ি বছর বয়সে পৌঁছে দেখলাম, সেরকমটা আর হচ্ছে না। কিন্তু তখনও স্তনের বৃত্তে কেউ মুখ রাখলে সেই মুখটাকে আমি দু-হাতে চেপে ধরে রাখতাম; ছাড়তে ইচ্ছে করত না। এটা বলছি দশ বছর আগের কথা।'

হঠাৎই স্ট্যানলি যেন বুঝতে পারল, গল্পটা কোনদিকে গড়াচ্ছে। সেও কনুইয়ের ওপরে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে মুখটা আসমানির মুখের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে বলল, "তারপর?'

'ছ'বছর আগে স্তনের বৃত্তের আলোগুলো নিভে গেল। তখন বিদ্যুতের জীবন্ত তারের খোলামুখ ছিল শুধু আমার ভগাঙ্কুরের শীর্ষে। ভগাঙ্কুরে আর ক্ষুদ্রোষ্ঠে পুরুষের স্পর্শ পেলে তখনও সারা শরীরে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে যেত। এখনও যায়, তবে সময় লাগে অনেক বেশি। কিংবা এই আজকের মতন আমার পিপাসাকে হতে হয় আকাশচুম্বী, নাহলে মৈথুনে আর চরমসুখ পাই না। এবং আমার একার নয়, আমি বহু নারী-পুরুষকে তাদের গত বারো বছরের ডিজায়ারের প্যাটার্ন নিয়ে প্রশ্ন করেছি। সকলেই বলেছে একই কথা; কামনা কমে আসছে, তৃপ্তি প্রায় কিছুই থাকছে না। এখনও প্রত্যেকে ভাবছে, এটা তার ব্যক্তিগত অপারগতা তার ব্যক্তিগত লজ্জা। সেই লজ্জাটাকে লুকোতেই এখনও নারী-পুরুষ সঙ্গমে লিপ্ত হচ্ছে। যখন জেনে যাবে, এটা সার্বজনীন ব্যাধি, তখন আর যৌনক্রিয়া বলে কিছু থাকবে না।'

স্ট্যানলি বলতে গেল, 'তাহলে চারিদিকে এত যে রেপ।'

'উঁহু। রেপের সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক খুব কম। খুনি-মানসিকতার থেকে রেপিস্টের জন্ম হয়। যত আমাদের মনের শূন্যতা বাড়বে, খিদে বাড়বে, ততই রেপও বাড়বে। যাই হোক, আমার ভাবনাটা কি তোমাকে বোঝাতে পারলাম? প্রকৃতি যেহেতু আর চাইছে না যে মানুষের জিন পরের প্রজন্মে প্রবাহিত হোক, যেহেতু প্রকৃতি আর চাইছে না যে, মানুষের সন্তান হোক, তাই প্রকৃতিই আর আমাদের ঘুষ দিচ্ছে না। কেন দেবে? প্রকৃতির থেকে বেশি কৃপণ তো আর কেউ নেই।'

রাত প্রায় দুটো বাজতে চলেছিল। পরের দিন আবার স্ট্যানলির মর্নিং-ডিউটি ছিল। তাই আর কথা না বাড়িয়ে ওরা দুজনেই সেই রাত্তিরের মতন ঘুমিয়ে পড়ল।

৪

তিনটে শহরে মোট আঠারোটা স্কুল ছিল। সবকটাই কো-এড। ছ'বছর বয়স হলে ছেলেমেয়েরা ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হত। ক্লাস-সিক্স অবধি পড়াশোনা করে তারা স্কুল থেকে বেরিয়ে যেত।

হ্যাঁ, স্কুলগুলোতে ক্লাস-সিক্স অবধিই পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। হাইস্কুল, কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটি বলে কিছু ছিল না, কারণ, ছেলেমেয়েদের অত শেখানোর মতন বিদ্যাও কারুর কাছেই ছিল না।

ব্যক্তিগত স্তরে ডক্টর আহমেদ কিংবা তাঁর মেয়ে আসমানির মতন কেউ-কেউ কোনও-কোনও বিষয়ে আরেকটু বেশি জানতে পারেন হয়তো, কিন্তু তাঁদের দুয়েকজনের ওপরে ভরসা করে তো আর একটা আস্ত এডুকেশন-সিস্টেম তৈরি করা যায় না।

পরেরদিন সকালে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে হাজিরা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ট্যানলির ওপরে একটা কাজের দায়িত্ব চাপলো। আরও কয়েকজন মিস্ত্রিকে সঙ্গে নিয়ে তাকে ওই আঠারোটা স্কুলে যেতে হবে। আঠারোটা স্কুলেরই জলের কানেকশন ভাল করে জ্যাম করে দিয়ে আসতে হবে, যাতে কোনও ট্যাপ দিয়ে জল বেরিয়ে নষ্ট না হয় ।

অর্ডারটার তাৎপর্য বুঝতে একটু সময় লেগেছিল স্ট্যানলির। বাচ্চাদের স্কুলে জলের কানেকশন অফ করে দেওয়া হবে কেন? তারপরেই তার খেয়াল হল, তাইতো। বারো বছর আগে শেষ যে বাচ্চাগুলো জন্মেছিল, তারাও তো গত মাসে সিক্সথ ক্লাস পাশ করে বেরিয়ে গেল। এখন আর স্কুলগুলোর প্রয়োজন কী? ওদের বিদ্যুৎ, ওদের জলের কানেকশন, টিফিনের ব্যবস্থা সবই এবার উইথড্র করে নেওয়া হবে।

তারপর সারা দিনটা বড় খারাপ কাটল স্ট্যানলির। এ-কথা ঠিক যে, ত্রিশ বছরের জীবনে বহু রিক্ততা, বহু শূন্যতা দেখে সে অভ্যস্ত। সে দেখেছে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। দেখেছে সমুদ্রের জলে অর্ধনিমজ্জিত মহাকাশ-বন্দর। পাহাড়ের চূড়ায় হাঁটুভাঙা দৈত্যের মতন দোমড়ানো রাডার-স্টেশন। সে দেখেছে কীভাবে গত বারো বছরে আবাসনগুলোর একটার পর একটা জানলায় আলো নিভে যাচ্ছে। বারো বছর আগে সে নিজেই তো একদিন কলোনির মাতৃসদনগুলোর জলের কানেকশনও ঠিক এইভাবে জ্যাম করে দিয়ে আসতে গিয়েছিল।

তবু জীবন্ত একটা স্কুলের ছবি বোধহয় প্রতিটি মানুষেরই মাথার খুব গভীরে লুকোনো থাকে, আলো ছড়ায়। ভোরের রাস্তা দিয়ে স্কুলবাসের যাতায়াত। পাহাড়ি পাকদণ্ডী বেয়ে নেমে আসা শিশুদের কলকলানি। ছোট-ছোট কাঁধ থেকে আলগা হয়ে খসে পড়া ওয়াটার-বটলের স্ট্র্যাপ আর সাদা শার্ট কিংবা ব্লাউজের বুকে চকচকে স্কুলব্যাজ; এইসবই যেন মনে হয় বাতাস-মাটি-জলের মতনই চিরকালীন।

সেইজন্যেই একটার পর একটা ফাঁকা স্কুলবাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে একটা সময়ে স্ট্যানলির মনে হল সে আর চলতে পারছে না। কোথাও যদি লুকিয়ে বসে একটু কাঁদা যেত, তাহলে খুব ভাল হত। কারণ, সে দেখেছে ব্ল্যাকবোর্ডে চকখড়ি দিয়ে লেখা অঙ্কের সূত্র, ইতিমধ্যেই যা আবছা হয়ে এসেছে। দেখেছে, স্কুলের মাঠের ঠিক মাঝখানে সেন্টার-লাইনের ওপরে বসানো একটা ফুটবল, যেন ছেড়ে যাওয়া মাঠটার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছে বিদায়ী ছাত্রছাত্রীরা । দেখেছে অনেক বন্ধ হয়ে যাওয়া দেয়ালঘড়ি আর লাল-কাপড়ে মুড়ে রাখা ঘণ্টা। একটা স্কুলের ফাঁকা ঘরে বাসা বেঁধেছিল অন্য গ্রহের কিছু প্রাণী, যাদের অনেকটা গায়ে পালকওলা শেয়ালের মতন দেখতে। স্বভাবেও তারা শেয়ালের মতন গোপনচারী।

দেখতে-দেখতে স্ট্যানলির বোধবুদ্ধি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। মানুষের সর্বনাশের এত স্পষ্ট ছবি সে আগে কখনো দেখেনি।

আঠারোটা স্কুলের প্রতিটিতে জলের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে সে যখন আবার প্ল্যান্টে ফিরল তখন সন্ধে আটটা বেজে গিয়েছে। হিসেব মতন স্ট্যানলি তখন ছুটি পেতেই পারত, ফিরেই যেতে পারত নিজের কোয়ার্টারে, আসমানির কাছে। কিন্তু তার ইচ্ছে করল না। তার মনে হচ্ছিল, কী লাভ? আঠারোটা স্কুল যেভাবে আজ তাদের স্কুলত্ব হারিয়ে পশুর আবাস হয়ে দাঁড়াল, ঠিক সেইভাবেই কদিন বাদেই তার কোয়ার্টারটাও শূন্য হয়ে যেতে পারে। ঘর আর বাইরের কোনও তফাত খুঁজে পাচ্ছিল না সে আর ।

পৃথিবী এখন অনেক ছোট, মানে, মানুষের পৃথিবী। সামান্য স্থলভাগ, সেটুকু ঘুরে দেখতে বেশি সময় লাগে না। স্ট্যানলি অনেকটাই ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছে। সবটাকেই তার মনে হয়েছে ভীষণ অস্থির। বাথরুমের আয়নার ওপরে জলের ভাপের মতন ক্ষণস্থায়ী। যেন একটু বাদেই মুছে যাবে।

শুধু একটা জায়গাকেই তার মনে হয় শাশ্বত; মনে হয় চিরস্থায়ী।

এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ছাদের বিশাল গম্বুজটাকে দেখলে তার মনে হয়, কোনও সমুদ্রের জলস্ফীতি, কোনও ভূমিকম্প, কিংবা উল্কাপাত ওই বিশাল গোল গম্বুজটাকে ধ্বংস করতে পারবে না। কেন এমন মনে হয় সে জানে না। একটু ঘুরিয়ে তার দু-চারজন সহকর্মীকে সে প্রশ্ন করেছিল; তাদের ওরকম কিছু মনে হয় কিনা। উত্তর পেয়েছিল, না। মনে হয় না।

বিদ্যুতের এই আকালের দিনে, রাতের বেলায় গম্বুজটা অন্ধকারে ঢাকা থাকে । আলো জ্বলে না ওখানে। তাই গম্বুজটাকে দেখা যায় শুধু দিনের বেলায় ।

এত বছরের ধুলো ময়লা কিছুই যেন ওটার গায়ে বসে না। কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি কে জানে। কাকের ডিমের মতন হালকা নীল ওর রং, কাকের ডিমের খোলার মতোই চকচকে সারফেস। কিন্তু শেপটা ডিমের মতন নয়, বলের মতনও নয়। বোঝাতে গেলে বলতে হয়, মোমের ফোঁটার মতন শেপ। ভূমির বৃত্তাকার পরিধি আস্তে আস্তে ওপরের দিকে ছোট হয়ে এসেছে।

অবশ্য দিনের বেলাতেও কজন মানুষ এত খুঁটিয়ে ওটাকে দেখে সন্দেহ । তবে স্ট্যানলি দেখে। আগে দেখত শুধু প্রাচীন সভ্যতার এক অসামান্য রেলিক হিসেবে। আর যেদিন থেকে সে ওই তামার ফলকটা খুঁজে পেয়েছে, সেখানে দেখেছে এক মহান মস্তিষ্কের উল্লেখ, সেদিন থেকে সে গম্বুজটাকে এক অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে। তার কেমন যেন মনে হয়, ওটাই তাম্রফলকে উল্লেখিত সেই মহান মস্তিষ্ক। ওই নীল গম্বুজটা।

খুব অস্থির মন নিয়ে স্ট্যানলি ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যান্টের ছাদে চড়তে শুরু করল। সাবধানে উঠতে হচ্ছিল ওকে। বহুবছর ওই সিঁড়িতে যে কারুর পা পড়েনি তা বোঝাই যায়। জায়গায় জায়গায় সিঁড়ির ধাপ ক্ষয়ে গিয়ে গর্ত হয়ে রয়েছে, তার মধ্যে অসাবধানে পা পড়লে অবধারিতভাবে হাড় ভাঙবে। লোকের চোখে পড়ার ভয়ে আলোও জ্বালতে পারছিল না স্ট্যানলি। এক পা, এক পা করে অনেকদূর ওঠার পরে সে দেখল সে ছাদে উঠে এসেছে।

পায়ের অনেক নীচে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের শিরা-জালিকার মতন পাইপের বিস্তার। ট্যাঙ্ক দুটোকে এত ওপর থেকে ঠিক মানুষের কিডনির মতনই ছোট লাগছিল। এক হাতে সিঁড়ির রেলিং আঁকড়ে ধরে স্ট্যানলি অন্য হাত দিয়ে চোখদুটোকে কচলে নিয়ে আবার সামনে তাকালো। দেখল সমতল ছাদ। কোথাও কোনও গম্বুজের চিহ্ন নেই। 'এটার মানে কী? কী মানে এটার? আমি কী পাগল হয়ে গেলাম।' নিজের অজান্তেই বেশ চিৎকার করে কথাগুলো বলে উঠল স্ট্যানলি । তারপর নিজের নিরাপত্তার কথা ভুলে, শেষ কটা ধাপ লাফ দিয়ে টপকে পেরিয়ে এসে সমতল ছাদের মাঝখানে দাঁড়াল।

ছাদটা আয়তনে একটা ছোটখাটো ফুটবল খেলার মাঠের মতন । বাউন্ডারির পাঁচিল বরাবর পুরো ছাদটাকেই একবার চক্কর দিয়ে এল স্ট্যানলি। তারপর পাগলের মতন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল নোংরা ছাদের ওপরে। চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে রইল ওপরের দিকে, যদি সেই গম্বুজকে দেখা যায়। কিন্তু না, রাতের আকাশে স্তিমিত কিছু তারা ছাড়া তার চোখে আর কিছুই পড়ল না।

কতক্ষণ ওইভাবে শুয়ে ছিল জানে না স্ট্যানলি। তবে যখন সে আবার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসেছিল, তখন সেকেন্ড-শীফট শেষ হয়ে গেছে, মানে বারোটা বেজে গেছে। সেকেন্ড শিফটের কর্মচারীরা বেরোবার সময় দেখল স্ট্যানলি একটা অয়েল-শিট পেতে খোলা চত্বরের ওপরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে।

কয়েকজন পরিচিত মানুষ ওর দিকে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার স্ট্যানলি? শরীর অসুস্থ লাগছে কি? মেডিকাল-ইউনিটে খবর দেব?'

স্ট্যানলি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'দেখুন তো, গম্বুজটা দেখতে পাচ্ছেন?'

ওর সহকর্মীরা একবার ওপর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েই ভারি অবাক গলায় উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, পাচ্ছি তো। গম্বুজ তো আর বুদ্বুদ নয় যে, হঠাৎ ফেটে গিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।'

সত্যিই, গম্বুজটা রয়েছে। স্ট্যানলি নিজেও দেখতে পাচ্ছিল, ওটা যথাস্থানে রয়েছে। শুধু আর কেউ যেটা জানে না, সেটা ও আজ জেনে ফেলেছে।

ওই গম্বুজটার কাছে কোনোদিন কেউ পৌঁছতে পারবে না। কারণ একটা নির্দিষ্ট নৈকট্যের পরে ওই গম্বুজের এখানে আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না । সে হয় তো তখন অন্য কোথাও থাকে। স্ট্যানলি বুঝতে পারে, সেই দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ জায়গাতেও তার মতো কেউ যদি গম্বুজটার কাছাকাছি কখনো পৌঁছতে চায়, তাহলে পৌঁছতে পারবে না। কারণ গম্বুজটা তখন থাকবে এইখানে, এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ছাদে।

শুধু যেটা সে তার ধারণায় আনতে পারছিল না, তা হল, গম্বুজটাই কি সেই মহান মস্তিষ্ক, নাকি তার ধারক? নাকি মহান মস্তিষ্কের হাতের একটা যন্ত্র মাত্র? তিনি কি বসে আছেন আরও দূরে, মহাশূন্যের কোনও গোপন কন্দরে?

স্ট্যানলিকে উঠে বসতে দেখে তার সহকর্মীরা দু-চারবার তার কাঁধে চাপড় মেরে যে যার কোয়ার্টারের দিকে চলে গেলেন।

স্ট্যানলিও এবার বেরোবে। তবে প্রতিদিনই সে বেরোনোর আগে একবার প্ল্যান্টের প্রোডাকশন-রেজিস্টারটা চেক করে তবে বেরোয়। এটা তার নেশার মতন। না দেখলেও পারে। দেখলে কোনওই বাড়তি উপকার হয় না, কারণ, ঋতু অনুযায়ী এবং জীবিত মানুষের সংখ্যা অনুযায়ী জলের উৎপাদন নিজে থেকেই এখানে বাড়ে কিংবা কমে। প্রতিদিন যা প্রয়োজন তার থেকে এক লিটার জল বেশিও উৎপন্ন হয় না, কমও নয়। কিন্তু এই জটিল হিসেবটা কে রাখে, কে কিডনি-ফিল্টারের মেমব্রেনকে বাড়ায় কমায়, তা কেউ জানে না ।

যেদিন উৎপাদন একধাক্কায় বেশ কিছুটা কমে যায় সেদিন স্ট্যানলি বাড়ি ফিরে দু-পাতার ছাপানো বুলেটিনটাতে একবার চোখ বোলায়। সরকারি বুলেটিনটা দুপুরের দিকে পোস্টম্যান মারফত বাড়ি-বাড়ি পৌঁছোয়। অন্যান্য খবরের সঙ্গে বুলেটিনের শেষ পাতায় ছোট একটা বক্সের মধ্যে তিন-শহরের মৃত্যু এবং আত্মহত্যার দৈনিক হিসাব থাকে। স্ট্যানলি মিলিয়ে দেখেছে, মৃত্যুর সংখ্যা বেশি থাকলে জলের উৎপাদন অনেকটা কমে যায়।

এইসব থেকে স্ট্যানলি সিদ্ধান্তে এসেছে যে, এমন একজন কেউ আছেন, যিনি প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর দিকে নজর রাখছেন, এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ফিল্টারের দিকেও। যিনি মানুষের জন্মকে স্থগিত রেখেছেন এবং নারী-পুরুষের শরীর থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন অপ্রয়োজনীয় যৌনসুখ।

তিনি কে? মহান মস্তিষ্ক ?

তিনি কোথায়? নীল গম্বুজে ?

কোয়ার্টারে ফিরে স্ট্যানলি দেখল, আসমানি তার ব্যাগ গোছাচ্ছে। এই কদিনে তার এই কোয়ার্টারের ঘরে ওর সামান্য যা নিজস্ব টুকিটাকি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল, সবই আবার নিজের পিঠের ব্যাগে গুছিয়ে ভরে নিচ্ছে। স্ট্যানলি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি চলে যাবে? আর কটা দিন থাকলে হত না?'

আসমানি একটা জামা ভাজ করতে করতে ক্যাজুয়ালি প্রশ্ন করল, 'কেন ? " ওর ঠোঁটে একটা হালকা হাসি খেলে গেল, সেটা স্ট্যানলি খেয়াল করল না। স্ট্যানলি আন্তরিক সুরে উত্তর দিল, 'বহুদিন বাদে একজন মানুষের দেখা পেয়েছিলাম, যে কিছু অকাজের ভাবনা ভাবে; এই দুর্দিনে যেরকম ভাবনা ভাবাই পাপ। তবু আমার মতোই সেও না ভেবে পারে না। ভাল লাগছিল আসমানি তোমার সঙ্গে দিন কাটাতে। থাকতে পারবে না আর কিছুদিন?'

আসমানি স্ট্যানলির পাশে বসে ওর গালের সঙ্গে নিজের গালটা কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'আমারও ভাল লাগছিল স্ট্যানলি। তুমি যে-কারণটা বললে, ওই একই কারণে। কিন্তু ইতিমধ্যে কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তুমি জানো কিনা জানি না। সেইজন্যেই আমাকে কাল সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

স্ট্যানলি ওর দিকে তাকিয়ে রইল। আসমানি সেদিনের বুলেটিনটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'দ্বিতীয় পাতার ওপরের দিকে একটা খবর আছে দ্যাখো। হ্যাঁ, ওই মৃত্যু এবং আত্মহত্যার বক্সের ওপরের দিকে। গত ছ'মাসের মধ্যে প্রায় সাতশোজন নারী-পুরুষ নিখোঁজ হয়েছে। শুধু কলোনি থেকেই নয়, বাইরের পাহাড়ি গ্রামগুলো থেকেও।'

'নিখোঁজ হয়েছে!'

'তাছাড়া আর কী বলবে? ছ'মাস আগে পৃথিবীতে যতজন মানুষ ছিল, তার থেকে এই ছ'মাসের মৃত্যু এবং আত্মহত্যার সংখ্যাটা বাদ দিলে এখনকার জীবিত মানুষের সংখ্যাটা পাওয়া উচিত। জন্ম তো আর নেই।

কিন্তু বছরে দু-বার পৌরসভার তরফে যে আদমশুমারিটা করা হয়, যেটা এই চারদিন আগেই শেষ হল, সেখানে দেখা যাচ্ছে গুনতিতে পাওয়া সংখ্যাটা প্রায় সাতশোজনের মতন কম।'

'এটা কেমন করে সম্ভব? কারা হারিয়ে গেল?"

"সেটা তো বলা খুব মুশকিল, বিশেষত এই কলোনিতে। তোমাদের মতন যারা চাকরি করো, কোনও অফিসে হাজিরা দাও, তারা হারিয়ে গেলে পৌরসভা নিশ্চয় খবর পাবে। যারা পাহাড়ি গ্রামগুলোতে পরিবার নিয়ে থাকে, তারা হারিয়ে গেলেও খবর পাওয়া যাবে; তাদের আত্মীয়স্বজনেরাই খবর দেবে। কিন্তু তার বাইরে এই কলোনিগুলোয় যে পাঁচ লক্ষ লোক একা-একা জীবন কাটায়, রেশনের খাবার খায় আর ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে থাকে, কিংবা রাতের অন্ধকারে দল বেঁধে রেপ করতে বেরোয়, তাদের মধ্যে কেউ হারিয়ে গেলে সেই হারিয়ে যাওয়ার খবর কে রিপোর্ট করবে?

স্ট্যানলি বলল, 'এমন একজনের খবরও কি পাওয়া যায়নি যে সরকারি অফিস থেকে কিংবা পাহাড় থেকে হারিয়ে গিয়েছে?"

আসমানি বলল, 'গেছে। একজন পাহাড়ি মানুষের হারিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আমি আজ খবরটা পড়েই পৌরসভায় গিয়েছিলাম। জানলাম রিপোর্ট করেছেন কালিমোনাল গ্রামের ডক্টর রফিক আহমেদ, যিনি আমার বাবা। হারিয়ে গিয়েছেন ওই গ্রামেরই সেন্ডুপ ভুটিয়া, যাকে আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমার কাকা বলেই চিনি। কাজেই কেন আমাকে কাল যেতে হবে, বুঝতে পারছ নিশ্চয়?"

কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে কী যেন চিন্তা করল স্ট্যানলি । তারপর বলল, "আমি তোমার সঙ্গে যাবো।"

"সে কি!" বাস্তবিকই খুব অবাক হল আসমানি ।

'হ্যাঁ আসমানি, আমি এমনিতেও কিছুদিন ধরে একটু চারপাশটা ঘুরে দেখতে চাইছিলাম। আমার মাথায় কিছু প্রশ্ন জেগেছে। তার উত্তরগুলো এই পাঁচিলঘেরা জায়গাটার ভিতরে বসে পাওয়া যাবে না। বেরোতে হবে।'

'তাহলে আমার সঙ্গে যাবে বলছ কেন?'

'বলছি যে, তার কারণ, আমি এরকম ঘোরাঘুরিতে অভ্যস্ত নই ।

মোবিপাথের বাইরে খুব কম পা ফেলেছি। খোলা আকাশের নীচে জীবনের একটা দিনও কাটাইনি। অন্তত প্রথম কটাদিন যদি তুমি আমার সঙ্গে থাকো, তাহলে তারপরে আমি আলাদা রাস্তায় চলেই যেতে পারি।'

আসমানি বলল, 'বেশ তো চলো। তবে তার জন্যে তোমাকে আধঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে নিতে হবে। রাত্রিবেলাটাই হাঁটার উপযুক্ত সময়। সূর্যের নীচে বেরোনো মানে অযথা প্রাণের ঝুঁকি নেওয়া।'

৫

রাত্রিতে হেঁটে আর দিনে বিশ্রাম নিয়ে, পথে ক্যাকটাসের শাঁস আর শিকার করা খরগোশের মাংস খেয়ে কাটিয়ে, তৃতীয়দিন ভোরে ওরা দুজনে পাহাড়ের পায়ের কাছে পৌঁছলো। এরপর আর এক রাত পাহাড় ভাঙলে আসমানি পৌঁছে যাবে তার গ্রামে; কালিমোনালে।

'তুমি কোথায় যাবে?' স্ট্যানলিকে জিজ্ঞেস করল আসমানি। 'ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে আমাদের গ্রামে যেতে পারো।'

ওরা একটা গুহার ভিতরে ছায়ায় বসেছিল। বহুদিনের যাযাবর জীবন কাটানোর ফলে আসমানির এসব মুখস্থ। কোথায় দিনের বেলায় ছায়া পাওয়া যায়, কোথায় বালির নীচে পানীয় জল; দড়ির ফাঁস দিয়ে খরগোশ বা তিতির পাখিই বা কেমন করে শিকার করতে হয়, সবই ওর মুখস্থ। এগুলো না জানলে কলোনির বাইরের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা মুশকিল।

গুহার মুখটা সমুদ্রের দিকে। ওখান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিল স্ট্যানলি। আসমানির কথা শুনে ওর দিকে তাকালো। বলল, "ওই যে সমুদ্রের তীরে অনেকটা জায়গা নিয়ে একটা কনস্ট্রাকশন দেখা যাচ্ছে,

ওটাই কি অ্যালগী-ফার্ম? তুমি জানো?”

আসমানি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল ।

স্ট্যানলি বলল, 'তাহলে আমি একটা কাজ করি। আজ রাতে আমি ওখানেই চলে যাই। এক-দুদিন ওখানে কাটিয়ে, আমি কলোনিতে ফিরে যাব। এ-যাত্রায় আর তোমার গ্রামে যাওয়া হবে না। পরে কখনো যাব।'

‘কিন্তু আসবার পথে যে-শেল্টারগুলো দেখিয়েছিলাম, সেগুলো তুমি চিনতে পারবে? দিনের বেলায় মরুভূমির মধ্যে যদি ওগুলো খুঁজে না পাও, তাহলে মারা পড়বে কিন্তু।'

স্ট্যানলি বলল, ‘ঠিক পারব। আমি খুব মন দিয়ে ল্যান্ডমার্কগুলো দেখে রেখেছিলাম। তুমি চিন্তা কোরো না।”

পাথরের চাঙড় সাজিয়ে গড়া চুলায় সসপ্যানে কিছুটা জল গরম করতে দিয়ে আসমানি বলল, 'কিন্তু তুমি ওখানে কীজন্য যাচ্ছ? তুমি আসবার সময় বলেছিলে, তোমার মনে কিছু প্রশ্ন আছে। সেই প্রশ্নের উত্তর কি তুমি ওই অ্যালগী-ফার্মে পাবে ? '

‘পেতে পারি’। স্ট্যানলি বলল। ‘যদি দেখি, যদি দেখি ওখানেও অনেকটা কাজই মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই হয়ে চলেছে, যদি দেখি ওখানেও একটা কোনও অজানা শক্তি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, মানুষের কাজ শুধু যন্ত্রগুলোর মেইনেটেন্যান্স, তাহলে বুঝবো সেই একই মহান মস্তিষ্ক ওখানেও।'

আসমানির কুঁচকে ওঠা ভুরুর দিকে তাকিয়ে স্ট্যানলি একটু হেসে চুপ করে গেল। তারপর সসপ্যানের গরম জলের মধ্যে ওর রেশন থেকে বাঁচিয়ে আনা কিছু শুকনো মাছ আর নুন ফেলে দিয়ে আসমানির পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। ধীরে-ধীরে ওকে বলতে শুরু করল, ওয়াটার-ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে ওর অভিজ্ঞতার কথা। কীভাবে ও নিতান্ত আকস্মিকভাবে একটা তামার ফলকে মহান-মস্তিষ্কের উল্লেখ দেখতে পেয়েছিল। কীভাবে ও দিনের পর দিন ফিল্টারের ঢাকনার ভিতর দিয়ে দেখেছে মেমব্রেনের হ্রাসবৃদ্ধি। দেখেছে কীভাবে প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জলের উৎপাদন নিজে থেকেই কমে যাচ্ছে। এবং কীভাবে ও দেখেছে প্ল্যান্টের চূড়ার নীল গম্বুজের হারিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসা।

আসমানি হাঁটুর ওপরে চিবুক রেখে খুব মন দিয়ে পুরোটাই শুনল । তারপর বলল, 'তোমার কী মনে হচ্ছে এসব দেখে?”

স্ট্যানলি বলল, ‘দেখো আসমানি, নিশ্চিত করে কিছু বলার মতন বিদ্যে তো আমার নেই। বোধহয় আমরা যারা এখন পৃথিবীতে বাস করছি, তাদের কারুরই নেই। আমি শুধু আন্দাজ করতে পারি।'

‘বেশ তো। কী আন্দাজ করছ সেটাই বলো।'

‘তুমি তো নিশ্চয়ই জানো, হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির শিখর ছুঁয়েছিলেন। সেই প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁরা যা-যা করতে পারতেন তার কিছুই আমরা দেখিনি। আমরা শুধু এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে মুখে-মুখে চলে আসা কিছু গল্পই শুনেছি। শুনেছি এক গ্যালাক্সি থেকে আরেক গ্যালাক্সিতে তাঁদের মহাকাশযান দাবড়ে বেড়াত। শুনেছি, তাঁরা জরা ছাড়া আর সমস্ত ব্যধিকে জয় করে ফেলেছিলেন। শুনেছি এই পৃথিবীর সম্পদের আকর্ষণে অন্য গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা পৃথিবীতে নিয়মিত যাতায়াত করত।’

এইখানে স্ট্যানলির কথার মধ্যে আসমানি বলে ফেলল, ‘না। এটা শুধু শুনিনি। তারা যে আসত তার প্রমাণ হিসেবে ওই অন্যগ্রহের কিছু শ্বাপদ আমরা এখনও চোখে দেখতে পাই ।

‘ঠিক। আর শুনেছি তাঁরা দু-রকমের মেশিন বানাতে পারতেন। এক হচ্ছে পার্পিচুয়াল মেশিন, অর্থাৎ যে-মেশিন নিজেকে চালানোর শক্তি নিজেই জুগিয়ে নিয়ে অনন্তকাল ধরে কাজ করে যেতে পারত। কেমন করে পারত জানি না। আর দুই, ইনটেলিজেন্ট মেশিন; বুদ্ধিমান যন্ত্র।'

আসমানি ঘাড় নাড়ল। ও-ও ছোটবেলায় শুনেছে এমন সব গল্পকথা । তবে এতদিন সেগুলোকে গল্প হিসেবেই ধরেছে। আজ এখন, স্ট্যানলিকে খুব সিরিয়াসলি এগুলোর উল্লেখ করতে শুনে ও নড়েচড়ে বসল।

বলল, ‘হ্যাঁ, তারপর?’

স্ট্যানলি ওর বক্তব্যের শেষটুকু খুব তাড়াহুড়ো করে বলে গেল। বোঝাই যাচ্ছিল, এ-ব্যাপারে ওর নিজের ধারণাও একেবারেই পরিষ্কার নয়। ও বলল, ‘শোনো আসমানি। আমার ধারণা, যখন আমাদের সেই পূর্বজরা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের যাবতীয় জ্ঞান, বিদ্যা এবং প্রযুক্তি দিয়েও তাঁরা মহাপ্লাবন রোধ করতে পারবেন না, আগামী সাত-আটশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর এই কোনটুকুতে অল্প কিছু মানুষ কায়ক্লেশে ডুবন্ত জাহাজের ভাঙা কাঠ ধরে বেঁচে থাকার মতন করে বেঁচে থাকবে।'

আসমানি ওর কথার মধ্যে স্ট্যানলিকে বাধা দিতে চায়নি, তবু ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল; ‘তাঁরা কেমন করে বুঝলেন, ঠিক এই কোনওটাতেই ? ’ স্ট্যানলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, জানি না। তবে এই পৃথিবীটা আমাদের কাছে আজ যতটা রহস্যময়, ওঁদের কাছে নিশ্চয় ততটা ছিল না। মানে, আমাদের সেই পূর্বজদের কথা বলছি। আচ্ছা, বেশ। নাহয় ধরে নিলাম একটা কোনায় নয়, সম্ভাব্য বেশ কয়েকটা জায়গাতেই ওঁরা আমাদের এই ওয়াটার-ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, অ্যালগী-প্ল্যান্ট, সৌরশক্তিকেন্দ্র আর মোবিপাথের মতন কিছু প্রাণদায়ী জিনিস বানিয়েছিলেন; পশুর স্তরে নেমে-আসা বংশধরেরা যাতে অন্তত ততদিন সারভাইভ করতে পারে যতদিন না তারা আবার কিছুটা উন্নত হয়ে উঠছে। তাদের মধ্যে টিকে গেল এইটাই।” আসমানি বলল, ‘তোমার কথা মানলে, তাঁরা এটাও জানতেন যে, একদিন সেই বংশধরেরা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে মরবে।'

স্ট্যানলি বলল, ‘আমার বিশ্বাস, জানতেন। তবে আবারও বলছি, কেমন করে জানতেন তা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না।”

আসমানি ঠান্ডাচোখে কিছুক্ষণ স্ট্যানলির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বেশ, জিজ্ঞেস করব না। অন্য কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি। বুঝতেই পারছি, তুমি বলতে চাইছ, এই যাবতীয়, খাদ্য, পানীয়, বিদ্যুৎ, পরিবহণ এই সব কিছু জোগান দিচ্ছে এক পার্পিচুয়াল এবং ইনটেলিজেন্ট মেশিন, আমাদের পূর্বজেরা যার নাম দিয়েছিলেন মহান মস্তিষ্ক, তাই তো?”

'হ্যাঁ।'

‘আচ্ছা, আমাদের সেই পূর্বজেরা ‘মহান’ শব্দটার মধ্যে দিয়ে কি আসলে নিজেদেরই মহান বলতে চেয়েছিলেন? নাহলে, একটা মেশিন, সে যতই এফিসিয়েন্ট হোক না কেন, তার তো আর আত্মা নেই। সে কেমন করে মহান হবে?'

স্ট্যানলি একটু বিরক্ত গলায় বলল, ‘যদি বলতে চেয়েই থাকেন, তোমার আপত্তি কোথায় আসমানি? সত্যিই তো, আজ তাদের দূরদর্শিতার ফলেই তো আমরা বেঁচে আছি।'

স্ট্যানলি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আসমানি ফট ফট করে তিনবার হাততালি দিল। তার মুখে ফুটে উঠল তিক্ত এক হাসি।

হাসতে-হাসতেই সে বলল, ‘চমৎকার। এ-কথা তোমার মুখেই শোভা পায়, স্ট্যানলি। কারণ তুমি একজন পুরুষ এবং সরকারি চাকুরে। এবং তুমি যুবক। কিন্তু আমি যদি আজ কয়েক হাজার ধর্ষিতা নারীর কাছে গিয়ে মহান মস্তিষ্ক সম্বন্ধে তাদের মতামত জানতে চাই, তারা কি তাঁকে মহান বলবে?

আমি যদি সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াই যাদের কথা সবাই ভুলে গেছে, যদি তাদের প্রশ্ন করি, পার্পিচুয়াল মেশিনের এই সুশাসন কেমন লাগছে স্যার, কেমন লাগছে ম্যাডাম, তাঁরা কী বলবেন, আহা! কী মহান ?

‘তোমাদের মতন কয়েকজন প্রিভিলেজড মানুষের বাইরে আরও যে কয়েক-লক্ষ মানুষ রয়েছে স্ট্যানলি, যারা দিনের পর দিন শ্যাওলা আর শুকনো মাছ খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, কিংবা ধরো সেই বাচ্চাগুলো, যাদের ক্লাস সিক্সের পর লেখাপড়া ফুরিয়ে গেল, তাদের কাছে গিয়ে তুমি যদি ‘মহান’ শব্দটা উচ্চারণ করো,

তাহলে তারাও কি প্রশ্ন করবে না ইনটেলিজেন্ট-মেশিনের ব্লু-প্রিন্টের মধ্যে ওদের অমানুষ বানিয়ে তোলার পরিকল্পনাটাও ছিল কিনা?”

স্ট্যানলি মাথা নীচু করে বসে রইল। কিছুক্ষণ বাদে সে আসমানির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ‘তাহলে তুমি এই এই মেশিনকে কী বলবে?” ‘সে আসলে যা, তাই বলব।' সপাটে উত্তর দিল আসমানি। ‘বলব ডেভিলস ট্র্যাপ, শয়তানের ফাঁদ।

স্ট্যানলি বলল, ‘শয়তান মানুষকে বাঁচাতে চাইবে কেন?'

‘আমরা একসময় ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগদের বাঁচিয়ে রাখতাম কেন ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের পূর্বজরা না বুঝে একটা ঘোর শয়তানি-চক্রের মধ্যে পা দিয়েছিলেন। তাঁরা যাকে মহান মস্তিষ্ক বলে জেনেছিলেন, তা আসলে খুব দীর্ঘমেয়াদি একটা পরিকল্পনা। মানুষকে নিয়ে কেউ খেলা করছে, এবং তার খেলা এখনো শেষ হয়নি। '

স্ট্যানলি তবুও গোঁয়াড়ের মতন বলে উঠল, ‘আর, মানুষের এই বন্ধ্যাত্ব? এর জন্যে তো কোনও মেশিন দায়ী নয়। এ তো প্রকৃতির মার। তাহলে কোনটা শয়তানের খেলা আর কোনটা খেলা নয় কেমন করে বুঝছ?'

আসমানি বলল, ‘আমিও একটা সময়ে সেরকমই ভেবেছিলাম । আমার বাবা আজও তাই ভাবেন। কিন্তু এখন আমার অন্য কথা মনে হচ্ছে। অত নিশ্চিতভাবে কেমন করে বলছি আমরা প্রকৃতির মার? আমরা দিনের পর দিন যা খেয়ে চলেছি, তাও তো বানিয়ে দিচ্ছে তোমার ওই মহান মস্তিষ্ক । তুমি কি নিশ্চিত, কোনও বিশেষ জাতের সামুদ্রিক অ্যালগীর মধ্যে এমন কিছু জৈব-বিষ নেই যা নারীদের বন্ধ্যা করে দিতে পারে ? ’

স্ট্যানলি দু-হাতের মধ্যে নিজের মাথাটা চেপে ধরল। বলল, 'না। এভাবে আগে কখনও ভাবিনি। সত্যিই কি অসহায় অবস্থার মধ্যে বাঁচছি আমরা। যেন শরণার্থী শিবিরের আশ্রিত। নিজেদের হাতে কিছুই নেই, যন্ত্রের ছুড়ে দেওয়া ভিক্ষান্নের ওপর নির্ভর করে বেঁচে রয়েছি।'

আসমানি বলল, ‘শরণার্থীদের তবু আশা থাকে; ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে আশা। এখন মানুষের সেটুকুও নেই। যেহেতু আমাদের আর সন্তান হবে না, তাই আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারব না। কিন্তু সত্যি বলছি স্ট্যানলি, এই সমস্ত চিন্তার থেকে বড় চিন্তা যা আমাকে এই-মুহূর্তে ভাবিয়ে তুলেছে, তা হল গত ছ'মাসে সাতশোর বেশি মানুষের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা।'

‘যারা হারিয়ে গিয়েছে, তারা সম্ভবত মারা যায়নি' স্ট্যানলি বলল ।

‘তোমার এমন আশাবাদের কারণ?' আসমানির গলায় কি একটু বিদ্রুপের ছোঁওয়া? থাকলেও স্ট্যানলি সেটা গায়ে মাখল না। উত্তরটা বেশ সিরিয়াসলিই দিল। বলল, ‘আমাদের ওয়াটার-প্যান্টের কন্ট্রোলটা যার হাতেই থাকুক, সে ভয়ংকর হিসেবি। প্রায় প্রকৃতির মতোই হিসেবি। আমার হাতে কিছুই নেই, তবু এই হিসেবটা আমাকে নেশার মতন টানে। আতঙ্কজনক দৃশ্যেরও একটা নেশা থাকে জানো তো। যে-কারণে রাস্তায় কেউ গাড়ি চাপা পড়লে একবার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে উঁকি মেরে মৃতদেহটাকে না দেখে আমরা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারি না।'

‘ঠিক ওইরকম একটা অস্বাভাবিক টান থেকেই আমি প্রতিদিন ছুটির সময় সারাদিনের জল তৈরির হিসেবটা দেখে বেরোই। দেখতে দেখতে এমন হয়ে গেছে যে, আমি ওই জলের হিসেব থেকে বলে দিতে পারি সেদিন কজন মানুষের মৃত্যু হল। পরে বুলেটিনের মৃত্যু ও আত্মহত্যার কলম থেকে চেক করে দেখেছি, আমার আন্দাজে কখনও ভুল থাকে না। তোমাকে বলছি আসমানি, গত ছ'মাসে হিসেবহীন মৃত্যু একদিনও দেখিনি। সাতশোজন মানুষ যদি মারা যেত, তাহলে আমাদের প্ল্যান্টের প্রোডাকশন হাজার ভাগের এক-ভাগ কমে যেত। তা কিন্তু কমেনি।'

আসমানি বুঝদারের মতন ঘাড় নাড়ল। বলল, ‘আমিও তোমাকে একটা খবর দিই। তোমার মতোই একটা অবজার্ভেশন। গত ছ'মাসে প্রায় সাড়ে তিনশো মেয়ে গর্ভবতী হয়েছে।'

উত্তেজনায় স্ট্যানলি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বলছ! এ তো, এ তো বিশাল একটা সুখবর। তুমি কেমন করে জানলে?'

স্ট্যানলির চোখেমুখে যে-আনন্দের ছাপ, তা হয়তো আসমানির মুখেও ফুটে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু তা হল না। চিন্তার ভ্রুকুটিয়েই গেল ওর মুখে। ওইভাবেই আসমানি জবাব দিল, “তুমি তো ফার্টিলিটি-চাপসের কথা নিশ্চয়ই জানো। সেই মহাযুদ্ধের পরে-পরেই সরকার থেকে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন থেকেই প্রত্যেকটা জন্মের ঘটনা মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল; মানে আমার বাবার মতন কিছু বোকা মানুষের কাছে। মায়েদের যাতে বিশেষ যত্ন নেওয়া যায়, পরিবার-হীন জগতে তারা যাতে হারিয়ে না যায়, তার জন্যেই কয়েকজন চিকিৎসক সরকারকে চাপ দিয়ে এই ব্যবস্থাটা নিইয়েছিলেন।

‘বাস্তবে অবশ্য তার পরেও মেয়েরা না খেতে পেয়েই মরেছে, সে গর্ভবতী হোক বা না হোক। আর ফার্টিলিটি চীপস কাজে লেগেছে ধর্ষণের তথ্য সংগ্রহ করতে। সে যাই হোক, বারো বছর বাদে আবার খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাড়ে তিনশো ফার্টিলিটি চীপস থেকে সঙ্কেত এসেছে, খবর এসেছে সাড়ে-তিনশো মেয়ের রক্তে সেই জৈব-রাসায়নিক ওঠাপড়ার, যার থেকে বোঝা যায় তারা প্রেগন্যান্ট।'

স্ট্যানলি অধৈর্য গলায় বলল, ‘কিন্তু তুমি এই আনন্দের খবরটা এরকম বিষণ্ণ মুখে দিচ্ছ কেন? আর ইউ নট হ্যাপি উইথ দা নিউজ।’

‘নো’। আসমানি বলল। ‘আমি খুশি হতে পারছি না। কারণ, ওই সাড়ে-তিনশো চীপস যাদের শরীরে রয়েছে, সেই মেয়েগুলি নিখোঁজ। ব্যাপারটা কি তুমি বুঝতে পারছ? হারিয়ে যাওয়া সাতশো মানুষের মধ্যেই রয়েছে ওই সাড়ে তিনশো মেয়ে, যারা হারিয়ে যাওয়ার পরে প্রেগন্যান্ট হয়েছে।'

‘মাই গুডনেস! ফার্টিলিটি চীপস লোকেশন দেখায় না?'

‘দেখায়, তবে মেয়েটি যদি কলোনি কিংবা আমাদের গ্রামগুলোর মধ্যে থাকে, তবেই। অর্থাৎ লোকালয়ের মধ্যে। তার বাইরে আর কোথাও চীপসের লোকেশন ডিটেক্টর ইনস্টল করা নেই। এটা স্যাটেলাইটের যুগ নয়।'

স্ট্যানলি কিছুক্ষণ পিঠের পেছনে দু-হাত জড়ো করে গুহার ভিতরে পায়চারি করল, মুখে চিন্তার গভীর ছাপ। তারপর বোধহয় কোনও খেই খুঁজে না পেয়ে, ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝের ওপরে পেতে রাখা ক্যানভাসের চাদরের ওপর। কাল সারারাত ওরা দুজনেই হেঁটেছে। তখনও বাইরে যে আগুনের হলকার মতন হাওয়াটা বইছিল, সেটাও একজন মানুষকে ঝিমিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। স্ট্যানলির চোখদুটো জড়িয়ে আসছিল। সে দেখল, আসমানিও ওর পাশে শুয়ে পড়েছে। ও-ও বড় বড় হাই তুলছে।

স্ট্যানলি ঘুমজড়ানো গলায় আসমানিকে বলল, ‘ভেবে দেখলাম, তোমার সঙ্গে যাওয়াটাই জরুরি। অ্যালগি-প্ল্যান্টে আর আলাদা কী হবে? ওয়াটার ট্রিটমেন্ট-প্ল্যান্টে যা হচ্ছে, তাই হবে। ওসবের থেকে অনেক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার মনে হচ্ছে অন্য কোথাও ঘটে চলেছে।'

ওদের দুজনের একসঙ্গেই ঘুম ভেঙে গেল। কেন যে ভাঙলো সেটা প্রথমে দুজনের কেউই ভাল করে বুঝতে পারেনি। গুহার প্রবেশপথের ভিতর দিয়ে যেটুকু বাইরের আকাশ দেখা যাচ্ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল, সবে সন্ধ্যা নামছে। তার মানে খুব বেশিক্ষণ তো ঘুমোয়নি ওরা। তাহলে? দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল কেন এইভাবে?

কোনও আওয়াজ এসেছিল কি? কোনও শব্দ ?

কিন্তু এই মরুভূমির মধ্যে শব্দ আসবে কোথা থেকে? শব্দ বলতে তো এখানে শুধু বালিয়াড়ির মধ্যে দিয়ে হাওয়া বয়ে যাওয়ার শোঁ শোঁ আর কচিৎ কখনও গুহার ভিতরে ঢুকে পড়া একটা মাছির ভনভন। সেসব তো দুজন হা-ক্লান্ত মানুষের ঘুম ভাঙানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এইসব ভাবতে ভাবতেই ওরা দুজনে একসঙ্গে শুনতে পেল সেই শব্দটা হ্যাঁ, নিশ্চয় এই আওয়াজেই ওদের ঘুম ভেঙেছিল। শব্দটা জোরালো নয় ঠিকই, কিন্তু অভাবনীয়। এতটাই অভাবনীয় যে, তা ঘুমের মধ্যেও ওদের মাথার ভিতরে পাগলা-ঘন্টি বাজিয়ে দিয়েছিল। প্রাচীন কোনও এক প্রতিবর্তে ওরা দুজনেই সতর্ক হয়ে উঠেছিল।

শব্দটা হাসির। শব্দটা কলরোলের। শব্দগুলো আসছে শিশুদের গলা থেকে। শিশুগুলি এই গুহা থেকে অনেক দূরে রয়েছে ঠিকই, তবু মরুভূমির হালকা-হাওয়া তাদের হাসি আর কথার আওয়াজকে অনায়াসেই আসমানিদের গুহা অবধি বয়ে নিয়ে এসেছে।

আসমানি আর স্ট্যানলি খুব সাবধানে, পা টিপে-টিপে গুহার মুখ দিয়ে বাইরে উঁকি মারল। যা দেখল তাতে প্রথমেই দুজনের মাথায় মরীচিকা কথা এল। অবশ্য খানিক বাদেই ওদের মনে পড়ল, মরীচিকা তৈরি হতে গেলেও কোথাও একটা বাস্তব-পদার্থের প্রয়োজন হয়; যার প্রতিবিম্ব ফোটে মরীচিকার বুকে। ওরা সেই-মুহূর্তে যা দেখছিল, তা বাস্তবে তখনকার পৃথিবীতে থাকার কথা নয়।

ওরা দেখছিল, অনেক দূরে বালিয়াড়ির বুক দিয়ে এগিয়ে চলেছে জনা-কুড়ি শিশু। তাদের মধ্যে ছেলে আর মেয়ে দুই-ই আছে, প্রায় সমান সংখ্যায়। কোনও বাচ্চাটিরই বয়স পাঁচ বছরের বেশি নয়। প্রত্যেকের পরণে স্কুল-ইউনিফর্ম। নীল স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ কিংবা নীল হাফপ্যান্ট, সাদা শার্ট। কাঁধে ওয়াটার-বটল, পিঠে স্কুলব্যাগ। হাসতে-হাসতে, গাইতে গাইতে, নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করতে-করতে ওরা বালির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। কখনো কখনো বালিয়াড়ির আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। আবার একটু বাদেই বেরিয়ে আসছিল খোলা জায়গায় ।

ওদের ছোট্ট দলটার মাঝখানে দুজন পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষ ছিলেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, ওদের টিচার। কিন্তু কিছুক্ষণ দেখার পরে আসমানি আর স্ট্যানলি, দুজনের মনেই সন্দেহ দেখা দিল, হয়তো তা নয়। দুজন অ্যাডাল্ট মানুষ কেমন যেন ঘুমের ঘোরে হেঁটে যাওয়ার মতন করে চলছিলেন। যেন কেউই চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। বাচ্চাগুলোর মধ্যে কেউ ওঁদের হাত ধরে সামনে থেকে টানছিল। কেউ পেছন থেকে ঠেলছিল। একটা মড়া আরশোলাকে যেভাবে একঝাঁক পিঁপড়ে নানান দিক থেকে টেনে এবং ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যায়, অবিকল সেই কায়দায় বাচ্চাগুলো ওই দুজন পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষকে নিজেদের গন্তব্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

স্ট্যানলি ফিসফিস করে বলল, ‘অসম্ভব। এ হতে পারে না। গত বারোবছর পৃথিবীতে কোনও শিশুর জন্ম হয়নি। এরা তাহলে কোথা থেকে এল?'

আসমানি কোনও কথা না বলে নিজের ব্যাগ থেকে একটা বাইনোকুলার বার করে নিয়ে এল। এটা সেই দুশো উনচল্লিশ বছর আগের আর্মি ডিসপোজালের মাল। ওর তস্য তস্য বৃদ্ধ পিতামহ সেই যুদ্ধে লড়াই করে মারা গিয়েছিলেন এবং বাইনোকুলারটি তাঁরই রাকস্যাকের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সযত্নে রক্ষিত ছিল। ঘোরাঘুরি শুরু করার পরে আসমানি অন্যান্য আরও কিছু দরকারি জিনিসের সঙ্গে এটাকেও নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। খুব কাজের জিনিস ।

বাইনোকুলারটা চোখে লাগিয়ে ওই গুহার মুখে বসেই আসমানি কিছুক্ষণ বাচ্চাদের দলটাকে দেখলো। তারপর ওটা স্ট্যানলির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ‘দেখো’।

স্ট্যানলি দেখতেই চাইছিল। কোনও কথা না বলে আসমানির হাত থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে চোখে লাগালো। পাশ থেকে আসমানি বলল, ‘বাচ্চাগুলোর ইউনিফর্মের হাতায় সুতোর ফোঁড় দিয়ে কী লেখা আছে দেখো।'

স্ট্যানলি কেটে কেটে উচ্চারণ করল; ‘নাটা বাড়ি নার সারি। নাটাবাড়ি নার্সারি! ওদের স্কুলের নাম?'

আসমানি বলল, ‘অবভিয়াসলি। সমস্যা হচ্ছে, এই পাহাড়ি গ্রামগুলোর মধ্যে নাটাবাড়ি নামে কোনও গ্রাম নেই। আমি বলছি, নেই। আমার জন্ম এইখানে। ফলে ওই নামে কোনও স্কুলও নেই এবং বারো বছর

বয়সের নীচে কোনও বাচ্চাও থাকা সম্ভব নয়। তবু ওই বাচ্চাগুলো নাটাবাড়ি নার্সারির ইউনিফর্ম গায়ে দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। যাবে ওদের পেছনে?'

মরুভূমির আকাশে খুব দ্রুত সন্ধে নেমে আসছিল। আসমানি আর স্ট্যানলি অনেকটা দূরত্ব রেখে ওদের অনুসরণ শুরু করল।

৬

সারারাত বাচ্চাগুলো হাঁটল। মাঝে-মাঝে একটু বসছিল। ওয়াটার-বটল থেকে দু-এক ঢোক জল খাচ্ছিল। জল খেতে খেতে এ-ওর পেছনে লাগছিল । কখনও পাথরের আড়াল-টাড়াল পেলে চলতে-চলতেই একটু লুকোচুরি খেলে নিচ্ছিল। এমনকি ওদের চিকন-গলায় আবৃত্তি করা নার্সারি রাইমের শব্দও শুনতে পাচ্ছিল স্ট্যানলি আর আসমানি ।

মাঝে-মাঝে বাচ্চাগুলো যখন অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিল, তখন ওদের ওই আবৃত্তির শব্দেই আবার ওদের খুঁজে পাচ্ছিল স্ট্যানলি আর আসমানি ।

খুব ভয় করছিল ওদের। ভয়ে গা শিরশির করছিল। ওরা বুঝতে পারছিল, যা ঘটে যাচ্ছে, তা স্বাভাবিক নয়। কুড়িটা বাচ্চা কোনও অভিভাবক ছাড়া মরুভূমির পথ ধরে পাহাড়ের দিকে হেঁটে যাবে, তাদের পরনে থাকবে স্কুল-ইউনিফর্ম এ আবার হয় নাকি! ততক্ষণে ওরা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, বাচ্চাদের দলে ওই পূর্ণবয়স্ক পুরুষ আর মহিলাটি সজ্ঞানে হাঁটছে না। ওরা হয় কোনও ড্রাগের ঘোরে আছে আর নাহলে ওরা সম্মোহিত।

ওই দুজনের উপস্থিতিই আরও ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল। পুরো দৃশ্যটার মধ্যে একটা উলটোপালটা ব্যাপার ছিল। বড়দেরই তো বাচ্চাদের গাইড করে নিয়ে যাওয়ার কথা। এখানে বাচ্চাগুলো নিয়ে চলেছে বড়দের। এবং এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিয়ে চলেছে যে, সন্দেহ নেই ওরা ওদের রাস্তা জানে, গন্তব্য জানে, কর্তব্য জানে; সব জানে ওই শিশুগুলি । সেইজন্যেই মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল ওরা শিশু নয়। কিন্তু তখনই আবার ভেসে আসছিল নার্সারি রাইমের আনন্দময় সুর। খিলখিল হাসির শব্দ ভোরের একটু আগে নাটাবাড়ি-নার্সারির ছেলেমেয়েরা পাহাড়ে চড়তে শুরু করে দিল। প্রায় আধমাইল দূরত্ব রেখে, ওদের পেছনে পেছনে চলল স্ট্যানলি আর আসমানি। মরুভূমির মধ্যে যতটা সাবধানতা নিয়ে ওদের ফলো করতে হচ্ছিল, এখন আর ততটা সাবধানতার প্রয়োজন নেই। কারণ এখন শিশুদের দলটা আর ওদের মধ্যে অনেক ঝোপঝাড়, অনেক বোল্ডারের আড়াল ।

আরও প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পরে বাচ্চাদের দলটা হঠাৎ একটা ইউ- টার্ন নিয়ে বেশ কিছুটা উতরাই ধরে নেমে গেল। আসমানি নিজের মনেই বলল, 'এটা কীরকম হল !"

স্ট্যানলি বলল, 'কেন? কী হল?"

'এদিকে তো কোনও গ্রাম নেই। কোনও মানুষই থাকে না এদিকে। তাহলে ওরা যাচ্ছে কোথায় ?"

বাচ্চাগুলো ততক্ষণে একটা ঝোরা পার হয়ে, উল্টোদিকের খাড়া চড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছিল। নীচে একটা অ্যাজেলিয়ার ঝোঁপের আড়ালে বসে স্ট্যানলি আর আসমানি দেখছিল, কি অনায়াসে ওরা; ওই কুড়িটা বাচ্চা চড়াই ভাঙছে। বরং ওদের সঙ্গের ওই পুরুষ এবং মহিলাটি মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। তখন শিশুরা হাসতে-হাসতেই ওদের ঠেলে দিচ্ছে পেছন থেকে। ধুলো-পাথরের ওপর দিয়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে ওদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

শিশুগুলো ঠিক শিশুদের মতোই নিষ্ঠুর। এবং প্রাণবন্ত।

স্ট্যানলি এবং আসমানি দুজনের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, দৃশ্যটা ওদের পক্ষে সহ্য করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত আর কতক্ষণ এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে সেটা জানার জন্যেই স্ট্যানলি আসমানিকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কখনও ওদিকে গেছ? গ্রাম তো নেই বললে। অন্য কিছু আছে? স্কুল-টুল ? ছিল কখনও?"

'উঁহু!' আসমানি ঘাড় নাড়ল। 'স্কুল ছিল না। তবে অন্য একটা জিনিস ছিল। একটা বিশাল মেটারনিটি-সেন্টার ছিল। আমার বাবা ওখানে কাজ করতেন। আমিও কয়েকবার গিয়েছি।'

স্ট্যানলি একবার অবিশ্বাসের চোখে সামনেই ওই চড়াই রাস্তাটার দিকে তাকালো। ওর মনের কথা বুঝতে পেরে আসমানি বলল, 'না। প্রেগন্যান্ট মেয়েরাই হোক কিংবা অন্য কেউ, মেটারনিটি সেন্টারটায় কাউকেই পায়ে হেঁটে যেতে হত না। পাহাড়ের একেবারে নীচ থেকে মেটারনিটি-সেন্টারের ছাদ অবধি একটা চমৎকার রোপওয়ে ছিল এবং নানান গ্রামের দিকেও রোপওয়েটার শাখা চলে গিয়েছিল।'

স্ট্যানলি বলল, 'কিন্তু এখানেই বা বানানো হয়েছিল কেন? তিন-শহর থেকে দূরে, এমনকি তোমাদের গ্রামগুলোরও উল্টোদিকে, এরকম একটা গড়-ফরসেকন জায়গায় ?'

ওরা দুজনে আবার বাচ্চাদের দলটাকে ফলো করতে শুরু করেছিল। চলতে-চলতেই আসমানি স্ট্যানলির প্রশ্নের উত্তর দিল; "শুনলে অবাক হবে, এই যে মেটারনিটি-সেন্টারটার কথা বলছি, এটাও তোমাদের ওই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, অ্যালগী ফার্ম কিংবা কলোনির আবাসনগুলোর সমসাময়িক। অর্থাৎ সেই মহাযুদ্ধের আগে আমাদের পূর্বজেরা 'মহান মস্তিষ্ক'র সহায়তায় এটিকে বানিয়েছিলেন। ভালই করেছিলেন। বহুবছর জিনিসটা মানুষের প্রসবকে নির্বিঘ্ন রেখেছিল। হয়তো আমরা বাঁজা না হয়ে গেলে আরও বহুদিন রাখতো।'

স্ট্যানলির গলার সুরে বহুক্ষণ বাদে হঠাৎ একটু ফুর্তির রেশ ফিরে এল। বলল, 'এই! আর বাঁজা ফাজার মতন শব্দ ইউজ করবে না। সাড়ে তিনশো মেয়ে প্রেগন্যান্ট, মনে রেখো। মানুষের সুদিন ফিরছে, আশমানি। এবং এখন আমার আবার মনে হচ্ছে তোমার ওই কনস্পিরেসি-থিয়োরি, ওই শয়তানের ট্র্যাপের চিন্তা ঠিক নয়।'

আসমানি বলল, 'ভুল হলেই খুশি হব। তবে সামনের ওই বাচ্চাগুলোকে দেখে একটা অমঙ্গলের চিন্তা মাথায় আসছে না? মনে হচ্ছে না খুব অশুভ একটা কিছু যেন ঘটতে চলেছে?'

স্ট্যানলি এর কী জবাব দিত জানা নেই, তবে ও কিছু বলার আগেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। যে দলটাকে ওরা তার আগের দিন থেকে ফলো করছিল, পাশের একটা শুঁড়িপথ বেয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিল ঠিক ওইরকমই আরেকটি শিশুদের দল। সেই নাটাবাড়ি নার্সারির ইউনিফর্ম। সেই হাসিখুশি গান-গাওয়া, ছড়া-বলা সব পাঁচ-বছুরে বাচ্চা এবং সর্বোপরি, এই দলটাও তিনজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে ঘেরাও করে নিয়ে এগোচ্ছিল।

কিছুক্ষণ ভাল করে দৃশ্যটা দেখেই আসমানি এবং স্ট্যানলি বুঝতে পারল যে, এই নতুন দলটার হাতে বন্দি হয়ে যে-তিনজন হতভাগ্য পাহাড়ে উঠছে, তারাও হয় ড্রাগড আর না হলে হিপনোটাইজড। তাদেরও ঠিক একইভাবে টেনে আর ঠেলে নিয়ে চলেছে বাচ্চাদের এই নতুন দলটা, যেভাবে মরা আরশোলাকে টেনে নিয়ে যায় খুদে পিঁপড়েরা। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। বাচ্চাদের চলা থামল না। তাই চলা থামল না আসমানি আর স্ট্যানলিরও। পায়ে-চলা সরু পাকদণ্ডীটাকে চারিদিক থেকে আড়াল করে রেখেছিল উঁচু পাহাড়ের দেয়াল। চিরছায়ায় ঢাকা এই পথে সূর্যের ক্ষতিকর রেডিয়েশন পৌঁছতে পারে না। দিনের বেলাতেও চলাফেরায় তাই সমস্যা নেই।

কিন্তু এটাও কি অবিশ্বাস্য নয় যে, ওই কুড়ি প্লাস কুড়ি চল্লিশটা বাচ্চা কুড়িঘণ্টার ওপরে একটানা হেঁটে চলেছে। হয়তো তারও বেশি, কারণ, কাল বিকেল পাঁচটায়, যখন স্ট্যানলিরা ওদের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করেছিল, তারও কিছু আগে থেকেই নিশ্চয় ওরা হাঁটছে। ওরা যে কলোনি থেকেই শিকার ধরে নিয়ে আসছে সে তো ওদের শিকারের চেহারা আর পোশাক-আশাক দেখলেই বোঝা যায়।

কেমন করে পারছে ওরা? ওরা কি মানুষ? না ভূত?

চিন্তাটা মাথায় আসতেই স্ট্যানলি বুঝতে পারল, ওর নিজের এবার একটু বিশ্রাম দরকার। ক্লান্ত মস্তিষ্ক ছাড়া ভূতের কথা কেউ ভাবতে পারে না। স্ট্যানলি করুণ-গলায় আসমানিকে বলল, 'একটু থামলে হয় না? আমি আর পারছি না।'

আসমানি বাইনোকুলার দিয়ে সামনের চড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই থামব। আমারও ক্লান্ত লাগছে। তার চেয়েও বড় কথা, বাচ্চাগুলো নিজেরাও এবার বিশ্রাম নেবার জন্যে থেমেছে। দেখো স্ট্যানলি, এটা চোখে লাগিয়ে দেখো; কি ওস্তাদ ওরা। দেখছ, কি সুন্দর ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে টেন্ট খাটাচ্ছে। ওদিকে দেখো, আরেকটা দল রান্না চাপিয়েছে। এসব কী ঘটে চলেছে স্ট্যানলি! ওদের বয়স পাঁচবছরের বেশি নয়, তবু এমন ম্যাচিওরিটি! নাটাবাড়ি নার্সারির টিচারদের দেখার জন্যে আমার ধৈর্য তো আর বাঁধ মানছে না। কি আশ্চর্য ট্রেনিং দিয়েছে তারা এই বাচ্চাগুলোকে!'

রাস্তার ধারে পাথরের একটা গভীর ফাটলের মধ্যে ঢুকে গেল আসমানি আর স্ট্যানলি। ওদের আগুন জ্বালানোর উপায় ছিল না। ধোঁয়া দেখলে বাচ্চাগুলো সতর্ক হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর স্ট্যানলি বলল, আমাদের খাবার জল শেষ হয়ে এসেছে, আসমানি। জেরিক্যানটা দাও। আসবার সময় একটা নালা পেরিয়ে এলাম। ওখান থেকে জল ভরে আনি।' জেরিক্যানটা স্ট্যানলির হাতে ধরিয়ে দিয়ে আসমানি বলল, 'খুব সাবধান কিন্তু। ওদের চোখে পড়ে যেও না।'

'না না। আমি একদম গাছের আড়াল ধরেই যাবো। আর এই তো দু-পা দূরেই তো যাচ্ছি। সেরকম কিছু হলে আমি তোমাকে ডাকব।'

স্ট্যানলি চলে যাওয়ার পরে পা থেকে জুতোদুটো খুলে আসমানি টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাবছিল বাড়ির কথা, বাবা-মার কথা । সাধারণত সে কলোনি থেকে গ্রামের বাড়িতে ফেরার সময়ে বাবার সঙ্গেই ফেরে। বাবা কলোনির ডিসপেনসারিতে রেপ-কিট তৈরির কাজ করে। সেটা যতটা না পয়সার জন্যে করে, তার চেয়ে বেশি করে ধর্ষিতা মেয়েদের প্রতি মমতাবশত। সেটা আসমানি বোঝে। কিন্তু এবারে বাবাকে ডাকতে গিয়ে দেখল বাবা নেই। সহকর্মীদের জিজ্ঞেস করে জানল, গত একমাস ধরেই বাবা কাজে আসছে না। কী হল কে জানে। শরীর-টরীর খারাপ হল না তো মানুষটার?

সেন্ডুপ আঙ্কলের কথাও ভাবছিল আসমানি। অমন স্বাস্থ্যবান এবং বুদ্ধিমান মানুষটা হারিয়ে যান কী করে?

চলার পথে নালার তিরতিরে জল একটা কুণ্ডের মধ্যে জমেছিল। সেই স্থির জলের মধ্যে জেরিক্যানের মুখটা ডুবিয়ে ধরে স্ট্যানলি ভাবছিল বাচ্চাগুলোর কথা। দূরবিনের মধ্যে দিয়ে যেটুকু সে দেখেছে, তাতে ওদের চোখেমুখে শুধু যে অদ্ভুত পাকামির ছাপই দেখেছে তা নয়। পাকা-বাচ্চাদের মধ্যেও একটা সুইটনেস থাকে; কিন্তু এদের চোখের চাউনিতে মানুষের যত বদগুণ যেন ফুটে বেরোচ্ছিল। নিষ্ঠুরতা, চালাকি, হিংসা এবং কাম

হ্যাঁ, কাম। স্ট্যানলি ওই ছেলেমেয়েগুলোর চোখের দৃষ্টিতে এবং আচার-আচরণে কামুকতার স্পষ্ট চিহ্ন দেখেছে। যেভাবে বাচ্চা ছেলেগুলো চলতে-চলতে বাচ্চা মেয়েগুলোর ব্লাউজের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছিল, যেভাবে মেয়েগুলোও ছেলেগুলোর হাত টেনে নিচ্ছিল নিজেদের স্কার্টের ভিতরে তা অবিশ্বাস্য, নারকীয়। ওরা কী? ওরা কারা? কোথা থেকে এলো ওরা। মানুষী মায়ের পেটে জন্মেছে তো বাচ্চাগুলো? ভাবতেই ভাবতেই স্ট্যানলি দেখল, জলের মধ্যে ওরকমই কয়েকটা মুখের ছায়া পড়েছে।

ও এত চমকে উঠল যে, ওর হাত থেকে জেরিক্যানটা ভেসে চলে গেল কুণ্ডের মাঝখানে। স্ট্যানলি মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। দেখলো ছ'টা মেয়ে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে; ছ'টা শিশু। উচ্চতা দিয়ে মাপলে ওদের কারুরই বয়স হয়তো পাঁচবছরের বেশি নয়, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ?

মেয়েগুলো দাঁড়িয়েছিল কুণ্ডের পাড়ে, আর স্ট্যানলি বসেছিল নীচে, ওদের থেকে বেশ কিছুটা নীচুতে। তাই মুখ তুলে স্ট্যানলি যখন মেয়েগুলোকে দেখল তখন একইসঙ্গে ও দেখল স্কার্টের নীচে ওরা কেউই অন্তর্বাস পরেনি । এবং ওদের যোনিকেশ দেখা যাচ্ছে। পাঁচবছরের মেয়েদের যোনিকেশ, যুবতীদের মতন।

একটা অদ্ভুত মাতাল-করা নোংরা গন্ধ স্ট্যানলির নাকে ধাক্কা দিল। ওর মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল। পড়েই যেত হয়তো গড়িয়ে, কিন্তু ওদের মধ্যে একটা মেয়ে, যে-মেয়েটা ঠিক ওর পেছনেই

দাঁড়িয়েছিল, সে ওর শার্টের কলারটা মুঠি করে ধরে একটা হ্যাঁচকা টানে ওকে কুণ্ডের পাড়ে তুলে শুইয়ে দিল। এবার বাকি মেয়েগুলোও এগিয়ে এলো। শুয়ে পড়ল ওর পাশে।

অর্ধ চৈতন্যের মধ্যে স্ট্যানলি দেখছিল, ওদের টোবা-টোবা লাল-লাল গাল, আঙুরের মতন ছোট্ট ঠোঁট। লাল রিবন দিয়ে মাথার ওপরে টেনে বাঁধা থোকা থোকা চুল আর রোগা-রোগা হাত-পা। ওরা শিশুকন্যা। কিন্তু ওরাই আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ওর ট্রাউজারের বোতাম খুলে নীচের দিকে নাবিয়ে দিচ্ছে। ওরাই শার্টের বোতাম খুলে পাগলের মতন ঠোঁট ঘষছে ওর বুকের রোমে। ওরাই ওর পুরুষাঙ্গটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে আস্তে আস্তে উত্তেজিত করে তুলছে এবং ফিসফিস করে বলছে 'তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের স্কুলে যাবে? নাটাবাড়ি নার্সারিতে যাবে?'

একটা বাচ্চা নিজের সাদা ব্লাউজ খুলে পুষ্ট একটা স্তন স্ট্যানলির মুখে তুলে দিল। অন্য আরেকজন ততক্ষণে স্ট্যানলির তলপেটের ওপরে চড়ে বসেছে। স্ট্যানলি সুখের আবেশে তলিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু তখনও ওর মস্তিষ্কের একটা ছোট্ট সজাগ অংশ আর্তনাদ করে বলছিল, 'এ হতে পারে না। এরা শিশু। আমি পাপ করছি, পাপ।'

যে-মেয়েটা ওর সঙ্গে বিপরীত বিহার করছিল, সে নিশ্চয় মন পড়তে পারে। স্ট্যানলির পুরুষাঙ্গকে নিজের ভিতরে রেখেই সে স্ট্যানলির মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ল। বলল 'আমার নাম অন্তরা। আমাকে তোমার মনে নেই স্ট্যানলি? তুমি চাকরি পেয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। তার আগে এরকম কত মুহূর্ত আমরা অসভ্যতা করে কাটিয়েছি। মনে নেই?'

মেয়েটা বলেই চলেছিল, "আমি বড় একা, বুঝতে পারছ না? তুমি যাবে তো আমাদের সঙ্গে? চলো দেখবে কি মজা ওখানে।'

অন্তরার নিতম্বের প্রবল দোলাচলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বীর্যপাত হল স্ট্যানলির। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ও চৈতন্য হারালো।

স্ট্যানলির দেরি দেখে আসমানি সেই পাথরের খাঁজটা থেকে মুখ বাড়িয়ে নালাটার দিকে তাকিয়েছিল। স্ট্যানলিকে সে দেখতে পেল না, কিন্তু দেখল নালার জলে হলুদ জেরিক্যানটা খুব ধীরে-ধীরে ভেসে যাচ্ছে।

আসমানি আর এক-মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ব্যাকপ্যাকটা পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে জঙ্গল আর পাথরের আড়াল ধরে ওপরের দিকে উঠে গেল। রাস্তা থেকে অনেক ওপরে। প্রায় পাহাড়ের চূড়ার কাছে। সেখানে একটা পাথরের আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে আসমানি বাইনোকুলারটা চোখে লাগিয়ে প্রথমে সেই শুঁড়িপথটার দিকে তাকালো, যে-শুঁড়িপথটার ওপরে নাটাবাড়ি নার্সারির শিশুরা বিশ্রাম নেবার জন্যে ক্যাম্প পেতেছিল।

সে দেখল, ওদের বিশ্রাম নেওয়া হয়ে গেছে। ওরা আবার চলতে শুরু করেছে। সারি বেধে ওরা এগিয়ে চলেছে আবার ওদের গন্তব্যের দিকে এবং সেই সারির একদম শেষে চার-পাঁচটি শিশুকন্যা স্ট্যানলিকে ঠেলতে ঠেলতে, টানতে-টানতে নিয়ে চলেছে।

আসমানির বুক ভেঙে একটা ফোঁপানির মতন শব্দ বেরিয়ে এল। এবার সে বাইনোকুলারের ফোকাসটাকে নিবদ্ধ করল আরেকটু দূরে, যেখানে এককালে মেটারনিটি সেন্টারটা ছিল। সে দেখল, সেন্টারটা এখনও আছে। শিশুদের চলার শুঁড়িপথটা যেখানে উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁছে আবার নীচের উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে, সেখানেই অনেকটা জায়গা জুড়ে একতলা বাড়িগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওপর থেকে দেখছে বলেই আসমানি দেখতে পেল, যেখানে যেখানে ছাদ ভেঙে গেছে, সেখানে-সেখানে প্লাস্টিকের নতুন ছাউনি বাঁধা হয়েছে।

কয়েকজন শিশু মিলে উঠোনে বসে কাঠের বেবি-কট বানাচ্ছে। বেবি-কটগুলো লম্বায় একহাতের বেশি নয়। চওড়ায় আধ-হাত। স্বাভাবিক বেবিদের পেট থেকে যদি বেবি জন্মায়, তাদের শোয়ার জন্যে ওর বেশি জায়গা লাগবে না। যে শিশুটি নাটাবাড়ি নার্সারির ইউনিফর্ম পরে বেবিকট বানানোর কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছিল,

তার মুখের সঙ্গে সেভুপ ভুটিয়ার মুখের খুব মিল। শুধু সেভুপ-আঙ্কলের সেই চিরস্থায়ী বিষণ্নতার বদলে মুখটা এখন উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে। আবার কাজ ফিরে পেয়েছে কিনা ।

তার পরেও পুরো একটা দিন আসমানি পাথরের মতন ওখানেই বসে রইল। জল ফুরিয়ে গিয়েছিল। খাবার তো তার অনেক আগেই ফুরিয়েছিল। তবু সেসব কিছুই তার খেয়াল ছিল না। সে শুধু অবাক হয়ে দেখছিল আট-দশজন শিশুর ছোট-ছোট দল কলোনির দিক থেকে, গ্রামের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে এসে পৌঁছচ্ছে নাটাবাড়ি নার্সারির চত্বরে। প্রতিটি দলের সঙ্গে দুজন, তিনজন, চারজন পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষ। সেই পূর্ণবয়স্করা নাটাবাড়ি-নার্সারির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। বেরিয়ে আসছে দু-জন, তিনজন, চারজন উলঙ্গ শিশু। ওন্যরা সোল্লাসে তাদের ইউনিফর্ম পরিয়ে দিচ্ছে।

আসমানি নিজের মনেই মাথা নাড়ল। মনে-মনে বলল, না, শিশু নয়। শিশুর মতন পূর্ণবয়স্ক মানুষ ওরা। ওদের ছোট্ট শরীরে বয়স্কদের মতন যৌনাঙ্গ অর্থাৎ রিপ্রোডাকশনের যন্ত্র।

রাত যখন প্রায় ভোর হয়ে আসছে তখন আসমানি উতরাই বেয়ে দ্রুত উলটোদিকে পা চালিয়ে নিজের গ্রামে পৌঁছলো; কালিমোনাল গ্রামে। গ্রামে কোনও মানুষ ছিল না। খেলার মাঠটায় সারি দিয়ে কিছু কবর মাথা তুলেছিল। কবরগুলোর মাটি তখনও কাঁচা।

আসমানি জানত, কবরগুলো কোথাও একটা থাকবে। কটা কবর থাকবে, তারও একটা আন্দাজ তার ছিল। গ্রামে যতজন বিগত যৌবন নারী-পুরুষ ছিল ততজনই। নাটাবাড়ি নার্সারিতে তার মানে বুড়োবুড়িদের জায়গা নেই। তবে শিশুজন্ম এবং শিশুপালনে যাদের কিছু ভূমিকা থাকতে পারে, তাদের নিশ্চয় ওরা মারেনি। যেমন সেভুপ আঙ্কলকে সে নিজের চোখেই একটু আগে দেখে এসেছে। ছোট হয়ে গেলেও বেঁচে আছে। ওর বাবা-মাও নিশ্চয় ওখানেই থাকবে। কারণ, ওরা ধাত্রীবিদ্যায় পারঙ্গম। ছোট হয়ে গেলেও বেঁচে থাকবে।

সেই রাতে আসমানির আর কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। তাছাড়া শরীরে আর নড়াচড়া করার মতন বলও ছিল না তার। মায়ের পরিত্যক্ত হেঁসেল খুঁজে সে কিছু শুকনো কন্দফল খুঁজে পেয়ে সেগুলোকে যতটা পারে কাঁচাই চিবিয়ে খেয়ে খেল । অন্ধকার বাগানে জলের কুণ্ডের ধারে বসে আঁচলা ভরে জলও খেল। তারপর যখন বাগান থেকে ঘরের দিকে ফিরছে তখনই তার চোখে পড়ল গ্রামের প্রান্ত থেকে নীচের দিকে তাকালে যেদিকে সেই দূরের ভ্যালিটার কিছুটা দেখা যায়, যে-ভ্যালিতে একসময় মেটারনিটি সেন্টার ছিল, এখন যেখানে নাটাবাড়ি নার্সারি, সেদিকের আকাশে একটা নীল আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

কৌতূহলবশত আসমানি সেদিকে এগিয়ে গেল এবং দেখল, সেই যে স্ট্যানলি ওদের প্ল্যান্টের ছাদে বসানো যে অগম্য নীল-গম্বুজের কথা বলেছিল, আসমানিও আসা-যাওয়ার পথে যে-গম্বুজটাকে অনেকবার দেখেছে, সেটাই এই মুহূর্তে নাটাবাড়ি-নার্সারির আকাশে স্থির হয়ে ভেসে আছে।

আসমানি ঘুম-জড়ানো চোখে থুঃ করে থুতু ফেলল। ভাবল, শালা মহান মস্তিষ্ক। আমাদের বাপ-দাদাদের বাপ-দাদারা পাঁচশো বছর আগে অন্যগ্রহের জীবদের সাহায্য নেবার সময় বুঝতে পারেনি খাল কেটে কোন কুমিরটা

ঢোকাচ্ছে।

ছোট পৃথিবী এবার নাটা লোকে ভরে যাবে। নাটাবাড়ি নার্সারির প্রোডাক্টে ভরে যাবে পৃথিবী। তারপর তাদের নিয়ে অন্য গ্রহের জীবেরা কী করবে কে জানে। ক্রীতদাস বানাবে সম্ভবত।

শিশুর মতন সরল, যৌনতায় ভরপুর ক্রীতদাস। তার চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে?

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল আসমানির। সে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল। একটা পরিত্যক্ত গ্রামে সে একা আজ রাত কাটাবে। রাত তখন কত কে জানে। আসমানির ঘুমটা হঠাৎই ভেঙে গেল। নিকষ অন্ধকার, তাই ঘরের ভিতরে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শুধু কিছু বাচ্চা, তাদের গায়ের দুধশাদা শার্টগুলো অন্ধকারের মধ্যেও ফসফরাসের মতন জ্বলছিল, তারা আসমানির বিছানা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

ওদের মধ্যেই একটা বাচ্চা ছেলে লাফ দিয়ে তার বিছানায় উঠে এল। পরক্ষণেই আসমানি অনুভব করল, নরম, ছোট্ট একটা হাতের তালু তার দুই-স্তনের ওপরে খেলা করছে। মুঠো করে চেপে ধরছে তার বৃত্ত। নেমে যাচ্ছে উরুর দিকে। উরুসন্ধির ওপরে চেপে বসছে। এইসবের মধ্যেই শিশুটি ফিসফিস করে ডাকল, 'আসমানি! আসমানি!' 'বলো।'

'তোমার একা লাগছে? তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে আমাদের স্কুলে ? নাটাবাড়ি নার্সারিতে ?

আসমানি উঠে বসল। হাতদুটো পেছনের দিকে নিয়ে, খোলা চুলগুলো জড়িয়ে একটা খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'হ্যাঁ, স্ট্যানলি। চলো।'

* * *

না-পুরুষের পৃথিবী

১

সরাইখানার মালকিন সেই বুড়ির বয়স হবে সত্তরের ওপরে। চেহারাটা মোটাসোটা। টুকটুকে ফরসা গায়ের রং। পরনে ইলিয়ানা-গ্রামের ট্র্যাডিশনাল পোশাক, যার নাম তামারো। রেশমের তৈরি গলা থেকে পা অবধি ঢাকা আলখাল্লা-টাইপের একটা ব্যাপার। মালকিনের মাথার গরদরঙা চুলগুলো একটা বাহারি ফ্লোরাল-প্রিন্টের স্কার্ফ দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা ।

আজ বিকেলে এই সরাইখানায় পৌঁছনোর পরে শারমিন প্রথম কাজ যেটা করেছিল সেটা হল ব্যাক-প্যাকের মধ্যে থেকে ওই সিল্কের স্কার্ফটা বার করে নিজের হাতে বুড়ির মাথায় জড়িয়ে দিয়েছিল। বুড়ির খুব পছন্দ হয়েছে জিনিসটা। এখনো অবধি একবারের জন্যেও মাথা থেকে খোলেনি।

শারমিন জানে, এই পার্সোনাল টাচগুলো খুব কাজে লাগে; পাশে বসে একটু গল্প করা, একসঙ্গে খাবার খাওয়া কিংবা ওই স্কার্ফের মতন সামান্য কিছু উপহার। ফিল্ড-ভিজিটে এলে এইটুকুর বদলেই সে গ্রামের মেয়েগুলোর কাছ থেকে ইনস্টিটিউটের জন্যে অনেক কিছু আদায় করে নিয়ে যায় ইলিয়ানা গ্রামটা দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ছোট পাহাড়ের পায়ের কাছে, সমতল জমির ওপর। ওই গ্রামের প্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে ইলিয়ানা উপত্যকা। গ্রাম থেকে একটা রেল-লাইন চলে গেছে মাইল চারেক দুরে নদীর তীর অবধি। গ্রামবাসীদের জন্যে সেই রেললাইন পাতা হয়নি অবশ্যই ; এখনও মেয়েদের অতটা আরাম করার মতন সুদিন আসেনি। লাইনটা পাতা হয়েছে পাহাড়চূড়ার গন্ধকের খনির জন্যে। দু-বছর আগেও এখান থেকে মোষে টানা গাড়ি করে গন্ধকের বস্তা নদীবন্দর অবধি নিয়ে যাওয়া হত । এখন স্টিম-ইঞ্জিনে টানা মালগাড়িতে বোঝাই করে গন্ধক নিয়ে যাওয়া হয় । সেই গন্ধক ভেলায় চেপে নদী পেরোয়, তারপর ছড়িয়ে পড়ে যেখানে প্রয়োজন । কাল রাতে ওরকম একটা ভেলায় চেপে নদী পেরিয়েছিল শারমিন। তারপর আজ ভোরে মালগাড়ির গার্ডের কেবিনে চেপে, এখানে এসে পৌঁছেছে।

এখন সারমিন বুড়ির সঙ্গে গল্প করতে বসেছে। আসল উদ্দেশ্য অবশ্য ওর সঙ্গে ভাব জমানো। বুড়ির কথা শুনতে-শুনতেই সারমিন কোলের ওপরে নোটবুক খুলে ইনস্টিটিউট থেকে ইলিয়ানায় এসে পৌঁছনোর খরচের হিসেব লিখছিল আর মাঝেমধ্যে হুঁ-হাঁ দিয়ে যাচ্ছিল। বুড়ি নিজের মনেই গুনগুন করে বকে চলেছিল। হঠাৎ কী যেন কথার মধ্যে বুড়ি বলে বসল, তোমরা তো বিশ্বাস করো না। ঈশ্বর থাকেন আকাশে। তিনি এক বিশাল পুরুষ। সুন্দর তাঁর দেহ। চারিদিকে যা কিছু দেখছো, সব তাঁরই সৃষ্টি।

শারমিন হিসেব লিখতে-লিখতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই শেষ কথাটায় সে ভুরু কুঁচকে বুড়ির দিকে তাকালো। শারমিন জানে, আদিবাসীদের উপকথাগুলোর মধ্যে তাদের জীবন-দর্শন লুকিয়ে থাকে। অনেক সময় এই ‘ফোক-লোরগুলোর মধ্যে তাদের ইতিহাসকেও খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এ কেমন দর্শন? এ কেমন ইতিহাস? এ তো রীতিমতন কুৎসিত কথা। ঈশ্বরের রূপ পুরুষের মতন কেন হবে!

চাকরির সুবাদেই শারমিন গত ছ'বছরে ইলিয়ানার মতন অন্তত পনেরোটা গ্রামে ভিজিট করেছে। পনেরোটা উপজাতির পনেরো-রকমের সৃষ্টিতত্ত্ব তার শোনা আছে। কিন্তু কোথাও তো ঈশ্বরকে পুরুষের রূপে কল্পনা করতে শোনেনি। ওরকম কল্পনা করাও মুশকিল। ওই জরব জন্তুগুলোকে কি ঈশ্বর-রূপে কল্পনা করা যায়?

শারমিন কোমলস্বরেই প্রতিবাদ করল। বলল, ঈশ্বরকে পুরুষ কেন ভাবছ মাসি? পুরুষরা কি কিছু সৃষ্টি করতে পারে? চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখো না। যদি তাঁর রূপ কল্পনাই করবে, তাহলে তাঁকে মায়ের

মতন করে ভাবো। বুড়ি জোরে-জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, তোমরা জানো না। পুরুষরাও একদিন মেয়েদের মতনই বুদ্ধিমান এবং হৃদয়বান ছিল। আজ মেয়েরা যা যা পারে, সেদিন পুরুষরাও তার সবই পারত। নিজেদের বুদ্ধিতেই চাষ করত, কাঠ কাটত, রাস্তা বানাত। খনিতে, কামারশালায় কিংবা কুমোরের চাকে কাজ করত। এমনকি ছবি আঁকা কিংবা মূর্তি গড়াতেও পিছিয়ে ছিল না। আজকের মতন বলদের পাশে জোয়ালে কাঁধ লাগিয়ে লাঙল টানত না তারা; বরং লাঙলের মুঠি হাতে ধরে জমি চষত।

বুড়ি দেখতে না পায়, এইভাবে সারমিন মুখ নিচু করে একটু হেসে নিল। ইলিয়ানার বাইরে যে-কোনও জায়গায় এই অদ্ভুত তত্ত্ব আওড়াতে গেলে মেয়েরা ওর গায়ে থুতু দেবে। কেউ সায় দেবে না এমন ঈশ্বর-কল্পনায়, কারণ, পৃথিবীতে এমন কোনও মেয়ে নেই যে ছোটবেলায় খেলার ছলে পুরুষমানুষকে কিছু শেখাবার চেষ্টা না করেছে এবং সেই চেষ্টায় ব্যর্থ না হয়েছে।

একটা কুকুরছানাকে ছুড়ে দেওয়া লাঠি মুখে করে তুলে আনতে শেখানো যায়। একটা গরু তার গোয়াল চিনে দিনের শেষে একা-একা ফিরে আসতে পারে। কিন্তু একজন পুরুষমানুষ নিজের জামাকাপড়টা অবধি নিজে পরতে পারে না। কাজেই পৃথিবীর যে-কোনও মেয়েকে যদি বলা হয় গরুরা এককালে নাম সই করতে পারত, সেটা তবু তারা বিশ্বাস করবে; কিন্তু পুরুষমানুষরা মেয়েদের মতনই বুদ্ধিমান জীব ছিল এটা বিশ্বাস করবে না।

শারমিন মজা করেই জিজ্ঞেস করল, তাহলে ওদের এই অধঃপতন হল কেন?

বুড়ি বলল, অধঃপতন কি শুধু ওদের? আমাদের নয়?

মানে?

জগৎটা কি মেয়েদের একা চালানোর কথা ছিল? ছিল না। ভগবান পাখির দুই ডানার মতন করে পুরুষ আর নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন। দুই ডানায় ভর করে তাঁর সৃষ্টির পাখি উড়বে, এই ছিল তাঁর বাসনা। তুষারযুগ এসে একটা ডানাকে ভেঙে দিয়ে গেছে। আমরাও সেই উন্নত সভ্যতা থেকে ছিটকে নীচে পড়েছি। অধোদেশে পতন, সেটাই তো অধঃপতন, না কী গো মেয়ে? বুড়ি টেবিলের ওপরে পেতে-রাখা শারমিনের হাতের পাতায় আলতো করে চাপড় মারলো। মুখে জ্ঞানীর মতন হাসি।

শারমিন হঠাৎই তর্ক করার জোরটা হারিয়ে ফেলল। এইবার বুড়ি যে-পয়েন্টটা তুলেছে, সেটা আদিবাসীদের উপকথা নয়, কল্পনা নয়। কঠোর সত্য। এই পৃথিবীর নারীদের পক্ষে সবচেয়ে নির্মম সত্য। একটা তুষারযুগ। আর তার পরে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস সব হারিয়ে ফেলা। এর চেয়ে বড় সত্য তো আর কিছু নেই। কেন এমন হল?

যুক্তি যার নাগাল পায় না, সেই উত্তরের খোঁজেই মানুষ রূপকথার আশ্রয় নেয়।

বৃদ্ধা বোধহয় শারমিনের মুখ দেখে তার মনের কথা পড়তে পারল। বলল, এটা ঠিক যে, ভগবান তুষারযুগ পাঠিয়েছিলেন পুরুষদেরই শাস্তি দিতে। ওদের অহঙ্কার বড্ড বেশি হয়ে গিয়েছিল। নারীদের অসম্মান করত; তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বলাৎকার করত। কিন্তু ওদের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়ে এসেছে। ভেবো না। খুব শিগগিরই আবার পুরুষেরা তাদের হারানো চেতনা ফিরে পাবে।

বুড়ি দুধের খালি গ্লাসটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দিল। শারমিন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। সন্ধে নামছে। দূরের পাহাড়গুলোর গায়ে সূর্যাস্তের কমলা আভা। জানলার ঠিক বাইরে একটা ওকগাছের ডালে দুটো ম্যাগপাই-পাখি পাশাপাশি বসে আছে। ছেলে পাখিটা মেয়ে পাখিটার ঘাড়ের পালকের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে মাঝে-মাঝে আদর করে দিচ্ছে। একটু আগে অবধি ওরা দুজনেই পালা করে ঠোঁটে করে পোকামাকড় নিয়ে আসছিল। এই গাছেই ওদের বাসা আছে। বাসায় বাচ্চা আছে।

শারমিনের মনে পড়ল ওর নিজের তিনটে বাচ্চার কথা। একটা ছেলে, দুটো মেয়ে। ছেলেটা হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ। মেয়েদুটোর মধ্যে একটা শ্যামাঙ্গী আরেকজনের তার মতন মাঝারি গায়ের রং। গর্ভধারণের প্রয়োজনে যখন যেমন 'সীডার' ওকে দেওয়া হয়েছিল, বাচ্চাদের গায়ের রংও ঠিক তেমনই হয়েছে। ওদের

বয়স এখন আট, পাঁচ আর দুই। ছেলেটাই বড়। তাকে একবছরের মাথায় ইনস্টিটিউটের ফার্মহাউসে নিয়ে গেছে। আঠেরো বছর বয়স হলে ওকেও সীডার হিসেবে কাজে লাগানো হবে। মেয়েদুটো ইনস্টিটিউটের নার্সারিতে মানুষ হচ্ছে।

চল্লিশ বছর বয়স হতে শারমিনের এখনো ছ'বছর দেরি আছে। তার মধ্যে সারমিনকে আরো অন্তত দুবার গর্ভধারণ করতে হবে, স্টেটের স্বার্থে। মানুষ যেহেতু ম্যাগপাই পাখি নয়, কাজেই শারমিন শুধুমাত্র সঙ্গমের সময় তার সন্তানের পিতাকে দেখবে। তারপর আর দেখবে না। কোনো মেয়েই দ্যাখে না।

এ ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে মিল রয়েছে মৌমাছিদের, এ কথা স্কুলের নিচু ক্লাসেই পড়ানো হয়। মৌমাছিদের চাকে পুরুষ মৌমাছিরা কোনো কাজ করে না। তারা শুয়ে-বসে থাকে আর রানি মৌমাছিকে গর্ভবতী করে। এই অকর্মা পুরুষদের ইংরিজিতে বলা হয় ড্রোন। মানুষের সমাজে বাচ্চা পয়দা করার পুরুষদের ড্রোন না বলে বলা হয় সীডার। সীড মানে বীজ। যারা বীজ জোগায় তারা সীডার।

পুরুষমানুষ বোঝাতে সীডার শব্দটাই সারা পৃথিবীতে ব্যবহৃত হয় । 'পুরুষমানুষ' এই শব্দটার মধ্যে যেহেতু মানুষ কথাটা জুড়ে রয়েছে তাই অনেক মেয়ে এতে অপমানিত বোধ করে। তারা বলে গরুমানুষ কিংবা কুকুরমানুষের মতনই অর্থহীন শব্দ ওই পুরুষমানুষ। তার চেয়ে সীডার ভাল। সীডারের মধ্যে কোথাও মানুষ লুকিয়ে নেই।

জানলার বাইরে দ্রুত সন্ধে নেমে আসছিল। শারমিন কোলের ওপরে খুলে-রাখা নোটবুকের দিকে তাকাল। লেখাগুলো আর পড়া যাচ্ছে না । ও নোটবইটা বন্ধ করে ব্যাক-প্যাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে গেল, আর সেই সময়েই একটা ভাঁজ করা কাগজ মেঝেতে পড়লো। কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে চোখের সামনে এনে দেখল শারমিন। ওর মুখে হালকা হাসি ফুটে উঠল। এটা বিনতার হাতের লেখা। ইনস্টিটিউট থেকে বেরোনোর আগে এই কাগজটায় ও ইলিয়ানায় পৌঁছনোর রাস্তাটা এঁকে দিয়েছিল।

ওর ছোটবেলার বন্ধু, বর্তমানের সহকর্মী বিনতা। সে একজন ভূতাত্ত্বিক । ইলিয়ানা ভ্যালির খোঁজ বিনতাই ওকে দিয়েছিল।

বছর-তিনেক আগে ইনস্টিটিউটের জিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে এখানে একটা সার্ভে হয়েছিল। তখনই বিনতা এই গ্রামটা দেখে গিয়েছিল।

ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিতে বসে, আগের মাসে এক সন্ধেবেলায় বিনতা ওকে বলেছিল, একবার ইলিয়ানা ভ্যালি থেকে ঘুরে আসতে পারিস। ওখানে যে গ্রামটা আছে, গ্রামটার নামও ইলিয়ানা, সেই গ্রামের মেয়েগুলোর সঙ্গে

কথা বলে মনে হয়েছিল ওদের শরীরে সেই প্রাক-তুষারযুগের বাসিন্দাদেরই রক্ত বইছে। মানে ওরা বরফের তাড়া খেয়ে আমাদের মতন বাইরে থেকে পালিয়ে এসে সেটল করেনি। ওরা তুষারযুগের আগে থেকে ওখানেই ছিল ওরা ওখানকার আদিবাসী।

আর? খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো শারমিন।

বিনতা একটু ভেবে বলেছিল, আর ওখানে পাহাড়ের গায়ে একটা গন্ধকের খনি আছে, হতেই পারে সেটাও তুষারযুগের আগের। গন্ধক জিনিসটা নিশ্চয় সেই উন্নত সভ্যতার মেয়েদেরও কাজে লাগত। খনিটা এখনও চালু আছে। ওটাই ওই গ্রামের মেয়েদের প্রধান জীবিকা ।

বিনতার কথা শুনে শারমিন তখনই মনে-মনে ঠিক করে নিয়েছিল, ইলিয়ানা গ্রামটা একবার দেখে আসবে। পুরনো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খুব কাজের জিনিস। এখনও অবধি ওরা কত কিছুই যে খুঁজে বার করেছে ওরকম সব ধংসস্তূপের ভিতর থেকে। এই তো, যে স্টিম-ইঞ্জিনটা আজ মালগাড়ি টেনে নিয়ে এল, সেটাই বা কতদিন আগে ওর তৈরি করতে পেরেছে? মাত্র চার বছর। চারবছর আগে আমেরিকার ইয়েলোস্টোন ইনস্টিটিউটের অনুসন্ধানী মেয়েরা গরম-কাদায় ভর্তি একটা পুকুরের ভিতর থেকে অবিকৃত একটা স্টিম-ইঞ্জিন খুঁজে পেয়েছিল। সেটার পেটের ভিতর থেকে সব কলকব্জা টেনে বার করে, স্টিম-

ইঞ্জিনের টেকনোলজি শিখে নিয়েছিল ওরা। তারপর সারা পৃথিবীর ছটা ইনস্টিটিউটের কারখানায় একযোগে শুরু হয়েছিল স্টিম-ইঞ্জিন তৈরির কাজ। পৃথিবীর যে ত্রিশটা শহরে মানুষের বাস আছে, দু-বছর আগে তাদের প্রত্যেকটাকে ঘিরে ট্রেন চলতে শুরু করে দিয়েছে। সৌজন্যে সেই ইয়েলোস্টোনের ইঞ্জিন।

কে বলতে পারে, এই ইলিয়ানার গন্ধক-খনির নীচেও সেরকম কোনও আশ্চর্য মেশিন লুকিয়ে আছে কিনা, যেটা মেয়েদের জীবনকে আরও একটু সহজ করে তুলতে পারে।

নোটবুকটা আবার ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে সারমিন উঠে দাঁড়াল । ঘামে আর ধুলোয় সারা শরীর চ্যাটচ্যাট করছে। এখনই একটু ভাল করে চান করতে না পারলে পাগল হয়ে যাবে।

অন্য একটা হালকা কাঁধব্যাগে ওর পোশাক-আশাক, তোয়ালে, সাবান এইসব ছিল। সেই ব্যাগটা হাতে নিয়ে শারমিন পায়ে পায়ে রান্নাঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

রান্নাঘরটাও বেশ বড়। ডাইনিং-স্পেসের মতনই এই ঘরেও পাইন কাঠের প্যানেলের দেয়াল, শ্লেট-পাথরের ছাদ। বিশাল উঁচু সিলিং থেকে দুটো পেল্লায় লণ্ঠন ঝুলছে। আরও অনেক কিছুই ঝোলানো রয়েছে সিলিং থেকে, হলুদ দিয়ে জরানো মাংস, রসুনের গোছা, আরও নানারকম অচেনা এবং অদ্ভুতদর্শন শেকড়-বাকড়, যেগুলো নিশ্চয়ই ওদের লোকাল মদ চোলাই করতে কাজে লাগে । রান্নাঘরের এককোণে বিশাল দুটো মাটির উনুন, একটা সাধারণ কয়লার উনুন অন্যটা তন্দুর।

বুড়িকে ও রান্নাঘরের ভিতরে দেখতে পেল না। অন্য কোথাও গেছে নিশ্চয়ই। তবে বুড়ির তিনটে মেয়েই এ-উনুন থেকে সে-উনুনের দিকে দৌড়োদৌড়ি করে রান্নার কাজ সারছিল। সন্ধে সাতটা বাজলেই গন্ধকের খনি থেকে লেবাররা ফিরতে শুরু করবে। ওই লেবারদের জন্যেই এই সরাইখানাটা চলছে। আজ নয়, অনাদিকাল ধরেই নাকি একইভাবে চলছে। মানে, যবে থেকে এখানে খনির কাজ আরম্ভ হয়েছে, তবে থেকেই।

আজ দুপুরে এখানে পৌঁছনোর পর শারমিন যখন প্রথম বুড়ি-মালকিনের মেয়ে তিনটেকে দেখেছিল, তখন ওর মনে হয়েছিল তিনটে পোলট্রির মুরগি। তিনজনেরই কুড়ির কোঠায় বয়স, গোলগাল চেহারা আর কঁঅক কঁঅক করে উচ্চৈস্বরে নিজেদের মধ্যে গল্প করে চলেছিল। তখন ওদের পরনে একটা করে তামারো ছিল; সেগুলোরও আবার ঠিক মুরগির পালকের মতন লাল-সাদা রং।

এখন আগুনের আঁচের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করছে বলে ওরা তিনজনেই কোমরের জড়িয়ে-রাখা তোয়ালে ছাড়া অন্য সব পোশাক খুলে ফেলেছে। ওদের বুকের ওপরে ঘামে ভেজা সুগোল স্তনগুলো আগুনের আভায় পাকা ফুটির মতন টসটস করছে এবং সেইজন্যেই ওদের এখন আর মুরগি ভাবা যাচ্ছে না।

শারমিনকে দেখে ছোট মেয়েটা হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এল। এর নাম মিনা। শারমিন ওকে বলল, একটু হাত-মুখটা ধুতাম।

মিনা বলল, এই তো, পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। বাগানটা পেরিয়েই দেখবে ঝোরার দিকে সিঁড়ি নেমে গেছে। দাঁড়াও। টচটা নিয়ে যাও । আলো কমে এসেছে তো, ফেরবার সময় পাথরে হোঁচট খেতে পারো। মীনা রান্নাঘরের তাক থেকে একটা টর্চ নিয়ে শারমিনের হাতে গুঁজে দিল।

ঝোরাটা খুব সুন্দর। ঠান্ডা স্বচ্ছ জলের স্রোত উপত্যকার হালকা ঢাল বেয়ে ধীর গতিতে নীচের দিকে বয়ে চলেছে। একটা পাথরের ওপরে পরনের জামা-কাপড়গুলো খুলে রাখতে গিয়েই শারমিন বুঝতে পারল তার ঋতু শুরু হয়েছে। তার মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল। ছোট মেয়েটার দু-বছর বয়স হল। এবার আবার গর্ভবতী হওয়াটা জরুরি। তিনবছর অন্তর সন্তানের জন্ম না দিলে ইনস্টিটিউটের অনেক সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত হতে হয়। গত সাত মাস ধরে সেই অনুযায়ী প্রতি মাসের উর্বর-সময়ে সে বাছাই সীডারের সঙ্গে সঙ্গমও করেছে। কিন্তু ঋতু ঋতুর মনে হয়ে চলেছে। আগে কোনওবার গর্ভসঞ্চার হতে এত সময় লাগেনি ওর।

ওর থেকে সামান্য দূরেই দুটো বছর বারো-তেরোর মেয়ে খালি-গায়ে ঝোরার পাড়ে বসে কাপড় কাচছিল আর মাঝে মাঝে অবাক চোখে শারমিনের দিকে তাকাচ্ছিল। একটা মেয়ে খুব ফরসা, সোনালি চুল আর নীল

চোখের মণি। অন্যজনের পেনসিলের শীষের মতন উজ্জ্বল কালো গায়ের রং, কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল আর বোঁচা নাক। শারমিন একটু গর্ব অনুভব করল।

যেভাবে নানা রঙের খেলার তাসকে একসঙ্গে শাফল করে খেলোয়াড়দের মধ্যে বেটে দেওয়া হয়, সেইভাবেই নানান চেহারার সীডারদের মিলিয়ে-মিশিয়ে সমানভাবে সবকটা গ্রামে-শহরে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটা ওদের মতন ছ'টা ইনস্টিটিউটই করে চলেছে। আজ নয়, গত একশো বছর ধরে এবং গোটা পৃথিবী জুড়ে। সেইজন্যেই ইলিয়ানার মতন একটা প্রত্যন্ত গ্রামেও আজ সাদা-কালো দুটো মেয়ে অনায়াসে পাশাপাশি বড় হয়ে উঠছে। এখানকার সীড-ফার্মের নানারঙের সীডারগুলোও ওদের ইনস্টিটিউট থেকেই এসেছে নিশ্চয়ই ।

মেয়েদুটোকে দেখে সারমিনের মনটা আবার বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠল।

ও ব্যাগের সামনের খাপ থেকে দুটো আপেল বার করে ঝোরার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে গলা তুলে চেঁচাল, হেই, ক্যাচ দেম ইফ ইউ ক্যান ।

দুটো মেয়েই একপলক আপেলগুলো দেখে নিয়েই পানকৌড়ির মতন মসৃণভাবে পাড় থেকে জলে নেমে গেল, এতটুকু জল ছিটকোলো না। দু-মিনিটের মধ্যে সাঁতার কেটে আপেলদুটো তুলে নিয়ে এসে ওরা একসঙ্গেই রিনরিনে গলায় চেঁচালো, থ্যাঙ্কইউ ম্যাম। ওদের দিকে হাত নেড়ে শারমিন আবার সিঁড়ি ভেঙে সরাইখানার বাগানে উঠে এল।

পেছনের দরজা দিয়েই রান্নাঘরে ঢুকল সে। এইবার বুড়িকে দেখতে পেল ওকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে বুড়ি বলল, ডাইনিং হলের বাঁদিক দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। দোতলায় উঠে সামনের ঘরটাই তোমার জন্যে সাজিয়ে দিয়েছি। তোমার ব্যাগটাও মিনা ওই ঘরে রেখে এসেছে। ওখানে গিয়েই রেস্ট নাও। আমরা এখন রাত নটা অবধি একটু ব্যস্ত থাকব। কাস্টমাররা চলে গেলে একসঙ্গে খেতে বসব, কেমন? আর তখনই শুনব, তুমি কী চাইছ।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে শারমিন দেখল ইতিমধ্যেই অন্তত সাত-আটজন নানান বয়সের মেয়ে খাওয়ার ঘরে ভিড় জমিয়েছে। সামনের পাকদণ্ডী পথটা ধরে আরও অনেকে খনি থেকে নেমে আসছে। যারা ঘরে বসে আছে তাদের প্রত্যেকেরই হা-ক্লান্ত চেহারা। পরনে মোটা নীল কাপড়ের ঢোলা ট্রাউজার্স আর ওই একই কাপড়ের শার্ট। বোঝাই যায় ওটা গন্ধক-খনির ইউনিফর্ম। প্রত্যেকের চেয়ারের পেছনে ঝুড়ি আর গাঁইতি নামানো রয়েছে। যেটা সবচেয়ে ইন্ট্রেস্টিং, ওদের চুলে, চোখের পাতায় কিংবা জামাকাপড়ের ভাঁজে যে ধুলো জমে রয়েছে, তার রং সোনালি-হলুদ। ধুলো নয়, গন্ধকের গুঁড়ো।

ওদের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে যাওয়ার সময়েই শারমিন লোকাল মদ, গন্ধক আর ঘামের একটা মিশ্র ঝাঁঝালো গন্ধ টের পেল। আশ্চর্য ব্যাপার, গন্ধটা তার খারাপ লাগল না। বরং কেমন যেন একটা সুখের অনুভূতি তার মনে চারিয়ে গেল ।

ওর জন্যে বরাদ্দ ঘরটায় ঢুকে জুতো খুলেই বিছানার ওপরে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল সারমিন। জানলা দিয়ে চোখ মেলে দিল বাইরে। কাচের শার্সির ঠিক ওপাশেই বাগানের ঝাউগাছের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। সেসব ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে, অনেক উঁচুতে, আগুনের কয়েকটা আঁকাবাঁকা রেখা কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। আগে কখনও না দেখলেও সারমিনের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না, ওই হচ্ছে পাহাড়চূড়ার গন্ধকের খনি। খনির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাসীয় সালফার হাওয়ার সংস্পর্শে এসে নিরন্তর জ্বলে যাচ্ছে। একতলার খাবার ঘর থেকে খনিশ্রমিকদের হইহল্লা আর গানের শব্দ ভেসে আসছিল। বেশ মেয়েগুলো। স্বাস্থ্যবতী, ফুর্তিবাজ।

শারমিন জানে, শুধু ওর মতন প্রযুক্তিবিদ আর আমলাদের হাত ধরে মানুষ জাতটা রক্ষা পায়নি। তুষারযুগ মানুষকে যেরকম উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে তাকে অন্তত প্রথম তিনশো বছর

টেনে নিয়ে গেছে পেশীশক্তি, স্রেফ পেশীশক্তি। আর কিছু নয়। নীচের ওই মেয়েগুলো সেই প্রবহমান পেশীশক্তির প্রতিভূ। সেইজন্যেই ওদের এত ভাল লাগে।

তুষারযুগের পরে নাকি সারা পৃথিবীতে সাদা চামড়া, কালো চামড়া, ব্রাউন-চামড়া সব মিলিয়ে মাত্র তিন-লক্ষ নারী-পুরুষ বেঁচে ছিল। আজ পাঁচশো বছর পরে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে চার লক্ষে। সীডারদের ধরলে সংখ্যাটা পাঁচ লক্ষে দাঁড়াবে। ধরতে তো হবেই, ওদেরও জন্ম যেহেতু নারীর গর্ভেই খুবই ধীর-গতির বৃদ্ধি, নিঃসন্দেহে। কিন্তু সময়টাও ছিল লড়াইয়ের। তুষারযুগ মানুষকে আদিম অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে আস্তে আস্তে আবার অনেক কিছুই তৈরি করে নেওয়া গেছে।

একেকটা আবিষ্কার মেয়েদের জীবনযাত্রাকে একটু করে সহজ করে দিয়ে যাচ্ছে।

‘আবিষ্কার’ নয়। আবিষ্কার তো করেছিলেন সেই আশ্চর্য আদিমাতারা, যারা বরফের নীচে হারিয়ে গেছেন। সেইজন্যেই বলা উচিত ‘পুনরুদ্ধার'। বরফের তলায় যা হারিয়ে গিয়েছিল সেগুলোকেই আবার নতুন করে খুঁজে

পাওয়া ।

সেইজন্যেই ওদের ইনস্টিটিউটের অ্যানুয়াল-জার্নালটার নাম 'The Quest' ।

অর্থাৎ ‘খোঁজ’।

শিল্প উৎপাদনের মতনই জরুরি এখন সন্তান-উৎপাদন। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি। পাঁচ লক্ষ সংখ্যাটা মোটেই নিরাপদ নয়। একটা প্লেগ কিংবা কলেরার মতন মহামারী তাদের সাফ করে দিয়ে চলে যেতে পারে। তাই আরও মানুষ দরকার।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে শারমিন মনে-মনে ভাবল, এই ট্যুর থেকে ফিরে গিয়েই ইনস্টিটিউটের সীড-ফার্মের ডিরেক্টর সৌমনাদিকে বলবে, আমার আরেকবার মেটিং-এর প্রয়োজন, সৌমনাদি ।

২

শারমিনের ঘুম ভাঙলো বুড়ির মেজমেয়ে জিনার ডাকে। ওর গায়ে আলতো ঠেলা দিয়ে জিনা ডাকছিল, দিদি, দিদি, ওঠো! নীচে চলো। একটু কিছু খেয়ে নাও, তারপর আবার ঘুমোবে ।

জিনার ডাক শুনে সারমিন উঠে বসল ঠিকই কিন্তু তারপর হাঁটুর ওপরে মাথা রেখে, কেমন যেন থম মেরে বসে রইল। জিনা উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কী হল দিদি? শরীর খারাপ লাগছে নাকি? খাবারটা ওপরে এনে দিই বরং। তোমাকে আর নীচে নামতে হবে না ।

শারমিন ঘাড় নেড়ে বলল, না। তার দরকার নেই। তুমি যাও। আমি চোখে-মুখে একটু জল দিয়েই আসছি। আসলে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তো, তাই মাথাটা কেমন যেন ভার হয়ে রয়েছে।

জিনা চলে যাওয়ার পরে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল শারমিন। বারান্দার রেলিং-এ হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রাত বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঠান্ডা হাওয়ার দাপটও বেড়েছে। শারমিন আন্তরিকভাবে চাইছিল, ওই হাওয়া যেন ওর মন থেকে স্বপ্নটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

হ্যাঁ, স্বপ্ন। জিনা যখন ওকে ডেকে তুললো তখন একটা স্বপ্নই দেখছিল শারমিন। শারমিন দেখছিল, একজন শিল্পী ক্যানভাসের ওপরে ছবি আঁকছেন। ঘরটা কোথায়, কে ওই শিল্পী, কিছুই সে জানে না। শিল্পীর পিছনদিকে দাঁড়িয়ে শারমিন দেখতে পাচ্ছিল, তিনি শারমিনেরই একটা পোর্ট্রেট আঁকছেন। তুলির বলিষ্ঠ টানে ফুটে উঠছে তার চিবুকের গভীর খাঁজ, ঘন ভুরু আর গালের একটু উঁচু হাড়, যে বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যে তাকে দেখলেই মনে হয় অসম্ভব জেদি আর সাহসী একটা মেয়ে।

স্বপ্নের মধ্যেই সে অবাক হয়ে ভাবছিল, কোনও নারীর মুখ কি কারুর আগ্রহের বিষয় হতে পারে?

কিন্তু শুধু তো মুখই নয়। ওই শিল্পী কেন অত যত্ন নিয়ে এঁকে চলেছেন ওর বাকি শরীরটা? কেন অত যত্নে রং লাগাচ্ছেন তামাটে দুই স্তনবৃন্তকে ঘিরে ছড়িয়ে-পড়া গাঢ় খয়েরি অ্যারিওলার বৃত্তে? কেন

আলোছায়ার তারতম্যে অমন আশ্চর্য ত্রিমাত্রিকতার আভাস নিয়ে আসছেন তার তলপেটের ঢালে, নাভির গভীর ঘূর্ণি আর যোনির ত্রিভুজে। স্বপ্নের মধ্যেই এক অদ্ভুত লজ্জায় শারমিনের কপালে ঘাম ফুটে উঠছিল।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই শারমিন শরীরকে দেখে এসেছে রক্ত মাংস দিয়ে তৈরি একটা মেশিন হিসেবে। ইস্পাতের তৈরি গিয়ার, চেন কিংবা শ্যাফটের মতোই যে-মেশিনটা একইভাবে কাজ করে।

তফাতও আছে। একটা জল তোলার পাম্পের ভিতর থেকে আরেকটা জল তোলার পাম্প বেরিয়ে আসে না। কিন্তু নারীর শরীর থেকে আরও শরীর তৈরি হতে পারে। শারমিন জানে, সেই হিসেবে তার এই শরীরটা, মানুষের তৈরি যে-কোনও মেশিনের থেকে অনেক বেশি এফিসেন্ট।

শারমিন একা নয়। পৃথিবীর প্রতিটি মেয়েই নিজের শরীরকে এইভাবে দ্যাখে; উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে।

সেইজন্যেই একটু আগের ওই স্বপ্নটা শারমিনকে এক অচেনা সুখের স্বাদ দিয়েছিল। স্বপ্নের মধ্যেই তার একপলকের জন্যে মনে হয়েছিল, আমার এই শরীর মরুভূমির আকাশে তারা কিংবা বরফের ওপরে ভোরের আলো কিংবা পাইনবনের ভিতর দিয়ে বয়ে চলা ঝর্নার মতন সুন্দর। ছবির মতন সুন্দর আমার শরীর তবে সেই স্বপ্নের শেষটুকু তখনও বাকি ছিল। একটা বড় কাচের জানলার পাশে স্ট্যান্ডটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে, সেই শিল্পী ছবি আঁকছিলেন। পিছনে দাঁড়িয়ে শারমিন দেখতে পাচ্ছিল শিল্পীর মাথা থেকে কোমর অবধি অনাবৃত । কোমরের নীচে আলতো হাতে জড়িয়ে রাখা একটা সাদা কাপড় আর ঘাড় অবধি লতিয়ে নামা চুল। হঠাৎই সেই শিল্পী যেন ছবির সঙ্গে বাস্তবের শারমিনকে মিলিয়ে নেওয়ার জন্যেই তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তখনই শারমিন দেখল, শিল্পীটি নারী নন, একজন পুরুষ। সীডার।

তার মুখভর্তি দাড়িগোঁফের জঙ্গল, চ্যাটালো শক্ত বুকের মাঝখান দিয়ে নেমে এসেছে কালো পশমের আবাদ। শুধু ওঁর চোখদুটো সীডারদের মতন নিষ্প্রভ নয়। অদ্ভুত সুন্দর টানা-টানা দুটো চোখের গভীর দৃষ্টিতে তিনি শারমিনের দিকে একবার তাকিয়েছিলেন। শারমিন স্বপ্নের মধ্যেই এমন একটা কাজ করেছিল, যেটা এই পৃথিবীর কোনও নারী বাস্তবে করে না। সে দ্রুত নিজের হাতের পাতাদুটো সামনে এনে সেই পুরুষ-দৃষ্টির সামনে থেকে তার বুক আড়াল করেছিল। স্বপ্নের এই জায়গাটাতে এসেই জিনার ডাকে ভেঙে গিয়েছিল তার ঘুম ।

পুরো স্বপ্নটাই ভীষণ হাস্যকর। কাউকে কোনওদিন বলতে পারবে না এতটাই হাস্যকর ওই সীডারের ছবি আঁকার দৃশ্যটা। একটা অবোধ জন্তু কি ছবি আঁকতে পারে ?

তবু হাসি পাচ্ছিল না শারমিনের; তার অস্বস্তি হচ্ছিল। হলেই বা স্বপ্ন। হলেই বা অলীক। তবু স্বপ্নের মধ্যেই সে যে আজ সম্পূর্ণ নতুন এক অনুভূতির স্বাদ পেয়েছিল, সেটা তো সত্যি। দুটো টানা-টানা চোখের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সুন্দর দেখার এই অনুভূতিটা কেমন, তা আজ সন্ধের আগে সে জানত না। ঘুম ভাঙার পরেও স্বপ্নের সেই মুহূর্তগুলো দামি সুরার বুদবুদের মতন তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে উছলে উঠছিল।

জোরে-জোরে বেশ কয়েকবার মাথাটা দুদিকে ঝাঁকাল শারমিন। তারপর মগে করে হিম ঠান্ডা জল তুলে ঘাড়ে থাবড়াল, চোখেও জলের ঝাপটা দিল। ধীরে-ধীরে বাস্তবের মাটিতে ফিরে এল সে। মুখ মুছে, চুলে একটু চিরুনি বুলিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল একতলায়।

রান্নাঘরে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল বুড়ি আর তার তিন মেয়ে। জিনা আর মিনার সঙ্গে আগেই আলাপ হয়ে গিয়েছিল তার। এবার বড় মেয়ে রাবিনার সঙ্গেও আলাপ হল । রাবিনাই তাকে হাত ধরে খাবার টেবিলে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, শরীর ঠিক আছে?

হ্যাঁ। আমার জন্যে তোমাদের খাওয়ার দেরি হল না তো?

রাবিনা বলল, একদমই না। কাস্টমাররা চলে যাবার পরে, সব গুছিয়ে নিজেরা খেতে বসতে আমাদের প্রতিদিনই এরকম দেরি হয়। শারমিন চেয়ার টেনে বসার পর রাবিনা জিজ্ঞেস করল, আপনি ইন্সটিটিউটে কোন পজিশনে

আছেন?

শারমিন উত্তর দিল, আমি একজন এক্সপ্লোরার । অনুসন্ধানী। কথাটা বলার পরেই সে খেয়াল করল, ওরা সকলেই একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শারমিন তাড়াহুড়ো করে যোগ করল; সোনা-রুপো নয়। আমি সেই তুষারযুগের আগের জিনিসপত্রের টুকরো-টাকরা খুঁজে বেড়াই ।

কেন? কী হয় ওসব দিয়ে? বুড়ি জিজ্ঞেস করল।

শারমিন বলল, কী হয়? বুড়িমা, তুমি যে এই উলের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসে আছ, তুষারযুগের হিমবাহ যখন আমাদের দুরুমুশ করে দিয়ে চলে গিয়েছিল, তখন এই কাপড় বোনার কলটাও মানুষের কাছে ছিল না। সবকিছুই কেউ-না-কেউ, কোনও-না-কোনও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে এনে নতুন করে তৈরি করেছে। গত পাঁচশো-বছর ধরে আমার মতন অনেকে এই কাজটা চালিয়ে গেছে বলেই আমরা টিকে গেছি।

সত্যি! অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল বুড়ির ছোটমেয়ে মিনা।

হ্যাঁ, সত্যি। কারণ, ওইসময়ে সীডার আর অন্য সব পশুপাখি তো ব্যাপক হারে মরেইছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, বরফের তলায় এক রাত্রির মধ্যে নিরানব্বই-ভাগ মহিলা চাপা পড়েছিল। তারা বেঁচে থাকলে আবার সব কিছুই নতুন করে গড়ে তুলতে পারতো, কারণ সেই নারীদের মাথার মধ্যেই তো পুরো সভ্যতার ব্লু-প্রিন্ট ধরা ছিল।

সেদিন তারা বাঁচেনি বলেই আজ আমরা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে ভাঙাচোরা জিনিস খুঁজে বার করি; তারপর ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরিতে বসে বুঝবার চেষ্টা করি সেগুলো আসলে কী।

মিনা ইতিমধ্যে প্লেটে-প্লেটে গরম হাতে-গড়া রুটি, স্যালাড আর ভেড়ার মাংসের ঝোল তুলে দিয়েছিল। একটুকরো রুটি ঝোলে ভিজিয়ে মুখে পুরলো শারমিন এবং মুখে দিয়েই বুঝতে পারল, মাংসের এই প্রিপারেশনটায় এরা এমন একটা ঝাল স্বাদের মশলা ব্যবহার করেছে, যেটা সে আগে কখনও টেস্ট করেনি। ল্যাম্ব-কারির সুস্বাদে তার চোখ বুজে এলো।

বুড়ি এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। টেবিলের মাথার দিকটায় বসে সে অন্যমনস্কভাবে রুটি ছিঁড়ছিল। মেয়েদের সঙ্গে শারমিনের কথোপকথন তার কানে ঢুকছিল কিনা তাই বোঝা যাচ্ছিল না। হঠাৎই সে আপনমনে বলে উঠল, কবেকার সংস্থা এই ইনস্টিটিউট! আমার মায়ের কাছে শুনেছি, তাঁদের ছোটবেলাতেও নাকি ইনস্টিটিউট থেকে ভলান্টিয়াররা এই গ্রামে আসত। নতুন-নতুন ফল আর ফসলের বীজ দিয়ে যেত। উন্নত জাতের ছাগল-ভেড়া-হাঁস-মুরগি দিয়ে যেত। আর ওষুধ-বিষুধ সবটাই তো ইনস্টিটিউটে তৈরি হত।

মিনা বলল, এখনও সব একইরকম রয়েছে, মা। ভোর থেকে রাত্রি, আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ইনস্টিটিউট।

নিজের কর্মস্থলের এমন প্রশংসা শুনে শারমিন খুশি হল। বলল, নতুন ওষুধটা চালু হয়েছে এখানে? পেনিসিলিন।

মিনা বলল, হয়েছে দিদি। ওটা একদম ম্যাজিক-ওষুধ। দু-বছর আগেও আমাদের এখানে বাচ্চা হওয়ার পরে দশজনের মধ্যে চারজন মেয়ে সূতিকারোগে মারা যেত। এখন কালেভদ্রে দু-একজন।

শারমিন বলল, জানো, বছর চারেক আগে ঠিক তোমাদের এই গ্রামের মতন একটা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আমি একরকমের ফাঙ্গাসের বীজ নিয়ে এসেছিলাম। ওই গ্রামের মেয়েরা ঘোড়ার জিনের ভিজে চামড়ার ওপরে এই ফাঙ্গাসের চাষ করত আর যে-কোনও দূষিত ক্ষতে এই ছত্রাকের রস লাগাত। সেরেও উঠত খুব তাড়াতাড়ি। ওরা আমাকে বলেছিল, তুষারযুগের অনেক আগে থেকে ওরা ওই ফাঙ্গাসের রস ব্যবহার করে আসছ।

ওরা তিনবোন একসঙ্গে বলে উঠল, তারপর?

সেই ফাঙ্গাস থেকে ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরিতে পেনিসিলিন তৈরি হয়েছিল। 'পেনিসিলিন' নামটাও নাকি তুষারযুগের চেয়েও পুরনো; ওই গ্রামের মেয়েদের মুখেই শুনেছিলাম। নামটা আমরা আর বদলাইনি।

ওদের মুখ থেকে বিস্ময়ের শব্দ বেরিয়ে এল। শারমিনকে ওরা যেন নতুন চোখে দেখছিল।

শারমিন বলল, আমরা যা খুঁজে পাই, পৃথিবীর বাকি পাঁচ মহাদেশের পাঁচটা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ভাগ করে নিই, যাতে প্রতিটি মানুষ তার উপকার পায়। ওই যে উন্নত জাতের মুরগি-ছাগলের কথা বলছ না, নিশ্চিত জেনো, ওগুলোও এরকমই কোনও গ্রামের মহিলারা হাজার-হাজার বছর ধরে পালন করে আসছিল, তুষারযুগের আগে থেকে। আমরা খুঁজে বার করেছি। তারপর সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি।

রাবিনা চিন্তিতমুখে বলল, কিন্তু আমাদের ইলিয়ানা গ্রামে তো ওরকম কিছুই নেই। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধে, খুব সাধারণভাবে জীবন কাটাই আমরা। বেঁচে থাকবার জন্যে খুব সামান্যই উপকরণের প্রয়োজন হয়। সে সবই তোমাদের ভীষণ চেনা।

শারমিন খুব নরম স্বরে রাবিনাকে বলল, যদি নাই পাই, ক্ষতি কী? পেতেই যে হবে তার তো মানে নেই। আর তাছাড়া আমি আজ অবধি এমন একটাও পুরনো গ্রাম দেখিনি যেখানে কিছু না কিছু নতুন জিনিস খুঁজে পাইনি। এই যে তোমরা মাংস রান্নায় একটা কী যেন গাছের রস ব্যবহার করেছ, ঝালঝাল স্বাদ আর ঝাঁঝালো গন্ধ, এটাই তো আমাদের অজানা। কে জানে, হয়তো এটাই একদিন সারা পৃথিবীতে খুব পছন্দের একটা মশলা হয়ে উঠতে পারে ।

বুড়ি আর তার তিন মেয়ে একসঙ্গে হেসে উঠল। বলল, ও বাবা! তোমার নাক তো সাংঘাতিক। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। যতদূর জানি আদা নামের এই শেকড়টা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। অথচ আমাদের ইলিয়ানা উপত্যকায় এটা আপনা থেকেই ফলে।

শারমিন বলল, আদা! নামটা?

মিনা উত্তর দিল, ওই পেনিসিলিনের মতোই। নামটা কারা দিয়েছিল জানি না। মনে হয় সৃষ্টির শুরু থেকেই ওই নাম ।

শারমিন একটু হেসে বলল, পুরনো গ্রামেই এমন পুরনো নাম খুঁজে পাওয়া যায়। এটাই মজা।

জিনা বলল, পুরনো গ্রাম মানে?

মানে যে-গ্রামগুলো তুষারযুগের আগে থেকে একই জায়গায় রয়েছে। হিমবাহের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসা মানুষের হাতে যে গ্রাম তৈরি হয়নি।

আমাদের ইলিয়ানা-গ্রাম বুঝি সেরকম? কেমন করে বুঝলে?

শারমিন বলল, পঞ্চাশ-বছর আগে ছ'টা ইনস্টিটিউট থেকে পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়ের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা হয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছিল সব মিলিয়ে তিন-চারশো এমন গ্রাম রয়েছে, যেগুলো তুষারপাতের আগেও ঠিক সেইখানেই ছিল। হয়তো সেসব জায়গায় হিমবাহের ধ্বংসলীলা কম হয়েছিল, তাই তুষারযুগের মধ্যেও সেই সব গ্রামে মানুষের জীবনযাত্রায় কোনও বিরতি আসেনি। এইধরনের গ্রামগুলোতে পুরনো-জিনিস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এই গ্রামগুলো আমাদের কাছে রত্নভাণ্ডারের মতন।

ইলিয়ানা সেইরকম একটা গ্রাম? প্রশ্নটা যদিও জিনা করল, কিন্তু বাকি সকলেই খাওয়া থামিয়ে শারমিনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

শারমিন বলল, হ্যাঁ। তোমাদের গন্ধকের খনিটাও সম্ভবত তুষারযুগের আগে থেকেই আছে। তোমরা জানতে না?

বুড়ি বলল, বাবা-মায়ের কাছে এরকম একটা কথা শুনেছিলাম বটে। গল্পগাছার মধ্যে দিয়ে ওদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সবাই উঠবে উঠবে করছে, এমন সময় ডাইনিং-স্পেসের দরজাটায় একবার ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। একঝলক ঠান্ডা হাওয়া বাইরে থেকে ঢুকে এল সরাইখানার মধ্যে। পরিষ্কার বোঝা গেল, কেউ ওদিকের দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকল। বুড়ি কান পেতে শব্দটা শুনল। তারপর গলা তুলে জিজ্ঞেস করল, কে? বৃহি নাকি ?

অন্ধকার ডাইনিং-প্লেস থেকে ভারী এবং খসখসে গলায় সংক্ষিপ্ত উত্তর ভেসে এল,হ্যাঁ।

খেয়েছিস কিছু,না খাবি?

ওদিক থেকে কোনও উত্তর এল না। মিনা চাপা গলায় মাকে বকে দিল, তুমিও যেমন, মা! অন্য কোথাও খাবার জুটলে কি পাগলি আর আমাদের বাড়িতে পা রাখে? তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, একটু বোস বৃহি। আসছি।

শারমিন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, কে?

রাবিনা শারমিনের পাশেই বসেছিল। উত্তর দিল, এই গ্রামেরই মেয়ে। আমাদের সঙ্গেই বড় হয়েছে। বেচারার মা মারা গেল বছর দুয়েক আগে। তারপর থেকেই ওর মাথাটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। জঙ্গলে পাহাড়ে একলা একলা ঘুরে বেড়ায়। শুধু খিদে পেলে গ্রামের কোনও বাড়িতে গিয়ে বলে খেতে দাও।

ওদের সবারই খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। শারমিন হাত ধুচ্ছিল। হঠাৎ জিনা বলে উঠল, বুঝলে দিদি। তুমি যা চাইছ, সেটা ওই বৃহি তোমায় দিতে পারে।

জিনার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, ওর দুই বোন ওকে প্রবলভাবে সমর্থন জানালো। বলল, তাইতো রে। এই কথাটা তো আমাদের খেয়াল হয়নি। হ্যাঁ গো শারমিনদি। বৃহিই তোমার জন্যে উপযুক্ত মেয়ে।

শারমিন অবাক হয়ে একবার এর মুখে একবার ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। রাবিনা ওকে বুঝিয়ে বলল, বৃহি যখন আমাদের এখানে আসে, মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সব জিনিস ট্যাঁকে করে নিয়ে আসে। কোথায় খুঁজে পায় কে জানে! তবে দেখলেই বোঝা যায় সেসব তুষারযুগের আগের জিনিস। আমাদের আদিমাতাদের ব্যবহৃত আশ্চর্য সব জিনিসের ভাঙা ফাটা টুকরো। এখন আর সেগুলোকে আমরা চিনতেও পারি না।

শারমিন শুনেই ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, চলো তো ওর কাছে যাই। আলাপ করি।

একটা থালায় কিছু খাবার গুছিয়ে নিয়ে জিনা ডাইনিং-স্পেসের দিকে চলল। পেছন-পেছন একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে রাবিনা। তার পেছনে শারমিন।

ডাইনিং-স্পেসটা বিশাল। শালকাঠের খুঁটি আর পাইনকাঠের দেয়াল দিয়ে তৈরি লম্বাটে একটা ঘর। মাথায় স্লেট পাথরের টালির ছাদ। ঘর জুড়ে এবড়ো-খেবড়ো তক্তার তৈরি লম্বা-লম্বা বেঞ্চ আর খাবার টেবিল। সুন্দর নয় কোনওটাই, তবে টেকসই। সরাইখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ওরা ছাদ থেকে ঝোলানো বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে, ওরকমই একটা কাঠের বেঞ্চে চুপ করে বসেছিল বৃহি বলে সেই মেয়েটা।

মেয়েটার গায়ে ছিল একটা অত্যন্ত ঢোলা আর পুরনো তামারো, তবু তার শরীরের কাঠামোটা যে বিরাট সেটা বোঝা যাচ্ছিল। জিনার হাতের লণ্ঠনের আলোয় ওর মাথার তেলহীন ধূসর চুলের বোঝা আর তীব্র কালো চোখের মণিদুটো ঝকমক করে উঠল। আরও একটু এগোতে দেখা গেল মেয়েটার হাতে একটা লাল রঙের আরকের বোতল। ওদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বৃহি সরাসরি বোতলটা তুলে মুখে ঢালল। সারমিনের অনভ্যস্ত নাকে মদের ঝাঁঝালো গন্ধ ধাক্কা মারল।

জিনা ইয়ার্কির সুরে বলল, আমি তো তোমার জন্যে সলিড খাবার নিয়ে এলাম। লাগবে? না লিকুইডেই চলে যাবে?

বৃহি মুখে কিছু না বলে খাবারের থালার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। ও মন দিয়ে প্লেটের ওপরে ঝুঁকে পড়ে রুটি খাচ্ছিল।

শারমিনের পাশে দাঁড়িয়ে রাবিনা চুপ করে ওর খাওয়া দেখছিল। কিছুক্ষণ বাদে বলল, ওকে আমরা ভালবাসি। যার বাড়ির দরজাতেই গিয়ে দাঁড়াক, ওর খাবার অভাব হবে না।

গোগ্রাসে খাওয়া শেষ করে, বৃহি পোশাকেই হাত মুছে নিল। তারপর মদের বোতল থেকে একচুমুক মদ খেয়ে সেটা কাঁধের ঝোলায় ঢুকিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

বৃহি বোধহয় চলে যাবার জন্যেই দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল । রাবিনা বলল, বৃহি, একটু দাঁড়াও। এই দিদি আমাদের গ্রামে প্রথম এসেছেন। তুমি যে পুরনো-জিনিসগুলো নিয়ে আসো, ওইরকম সব জিনিসের খোঁজে। তুমি ইনস্টিটিউটের কথা শুনেছ?

রাবিনা শারমিনের এখানে আসার কারণগুলো বলে যাচ্ছিল। বৃহি মন দিয়ে রাবিনার কথাগুলো শুনছিল; একইসঙ্গে তীব্র চোখে মেপে নিচ্ছিল শারমিনের আপাদমস্তক। সারমিনও বুহিকে দেখছিল। আপাদমস্তক নয়। ওর নজর আটকে গিয়েছিল বৃহির বুকে। ওর তামারোর বুকের ওপর একটা তাবিজ ঝুলছে। শারমিন ওই তাবিজটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না ।

গাঢ় সবুজ রঙের চৌকো একটা তাবিজ, কালো সুতোর সঙ্গে বৃহির গলায় ঝুলছে। খুব বেশি হলে বুড়ো আঙুলের নখের মতন বড় হবে। ওই ছোট্ট চতুষ্কোণের ওপরেই অসংখ্য সোনালি রেখার জ্যামিতিক বিন্যাস । আয়তক্ষেত্রকে ঘিরে আয়তক্ষেত্র। তাকে ঘিরে আরও আরও আয়তক্ষেত্র। কিন্তু কোনও আয়তক্ষেত্রটাই বিচ্ছিন্ন নয়। একটার সঙ্গে আরেকটা যে কোথায় মিশে যাচ্ছে ধরা মুশকিল।

সবুজ জমি আর সোনালি রেখার মাঝে-মাঝে কয়েকটা রুপোলি ফোঁটা এখানে-ওখানে এলোমেলোভাবে ছড়ানো।

শারমিন বৃহির দিকে সম্মোহিতের মতন এক-পা এগিয়ে গেল। তারপর ডানহাতের তর্জনির ডগায় ওর গলার তাবিজটাকে আলতো করে তুলে নিয়ে সেটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল। বৃহির নিশ্বাসের ঝাঁঝালো মদের বাষ্প সরাসরি শারমিনের নাকে ঢুকে যাচ্ছিলো, কিন্তু সেসব ও খেয়ালই করছিল না। সারমিন যখন কথা বলল, মনে হচ্ছিল ওর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। ও জিজ্ঞেস করল, এটা কোথায় পেলে?

কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বৃহি শারমিনের হাত থেকে তাবিজটা ছাড়িয়ে নিলো। তারপর এক-পা পিছিয়ে গেল । শারমিন মুখ তুলে দেখল বৃহি হাসছে, পাগলাটে এক হাসি। হাসতে-হাসতেই ও বলল, কেন? এটা আমার গয়না । আমি তৈরি করেছি।

উঁহু। মাথা নাড়লো শারমিন । তুমি তৈরি করোনি। এ জিনিস আমি চিনি। ইন্সটিটিউটের আর্কিওলজি-ডিপার্টমেন্টের আলমারিতে এরকমই কয়েকটা টুকরো রাখা আছে। বোধহয় কুড়িবছর আগে নামিবিয়ার কোনও এক্সক্যাভেসন সাইট থেকে পাওয়া গিয়েছিল। নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, তবে শুনেছি এর রহস্য ভেদ করতে পারলে প্রাক্ তুষারযুগের জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

বুহির মুখে সেরকমই খ্যাপাটে হাসি। বলল, আমার কাছে অনেক আছে। তুমি নেবে?

নেব। সংক্ষেপে উত্তর দিল শারমিন। তারপর বলল, আর কী আছে? একটা বই আছে। বুহি ওর ঝোলা থেকে একটা মোটা ডায়েরির মতন খাতা বার করে দেখাল।

শারমিন হাতটা বাড়াতেই বৃহি চট করে ওর হাতটা সরিয়ে নিল। বাচ্চা-মেয়ের মতন অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, দেব না। এটা আমার তুমি নিজে ওখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসো।

কোথা থেকে, বুহি?

ওই টিলা থেকে। আগে ছিল না। একদিন আকাশ থেকে একটা সোনালি তারা খসে পড়ল। তারা নয়, আসলে রুপোর তৈরি একটা ঘর। তারমধ্যে রুপোর জামাপ্যান্ট পরা একটা সীডার থাকে। একদিন ও ভুল করে ঘরের দরজা খুলে রেখে চলে গিয়েছিল, তখন আমি ঘরটায় ঢুকে এই জিনিসগুলো নিয়ে পালিয়ে এসেছি। তারপর থেকে সীডারটা দরজায় তালা দিয়ে রাখে।

তারপর? শারমিনের মন বলছিল এগুলো পাগলের প্রলাপ নয় । কথাগুলো দামি। মন দিয়ে শুনতে হবে। মনে রাখতে হবে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কী হল?

এদের বলেছিলাম আমার সঙ্গে গিয়ে ঘরটাকে আর লোকটাকে দেখে আসতে। কিন্তু এরা আমার কথা বিশ্বাস করে না। তাই ওদের এগুলো দেখাইনি।

শারমিন ঘাড় ঘুরিয়ে জিনা আর রাবিনার দিকে তাকাল। ওরা দুজনেই সঙ্কুচিতভাবে ঘাড় নাড়ল । রাবিনা বলল, ঠিকই বলছে। এই তো, তিন-চারদিন আগের ঘটনা। ভোরবেলা, তুমুল বৃষ্টি পড়ছিল। বজ্রপাতও হচ্ছিল খুব। তারমধ্যেই ও আমাদের ডাকতে এসেছিল। আমরা ভেবেছিলাম ওর পাগলামি ।

শারমিন আবার বৃহির দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে টিলায় নিয়ে যাবে? আমি ওই সীডারটাকে দেখব।

বুহি একগাল হেসে ঘাড় হেলাল। বলল, চলো।

রাবিনা বলল, এই অন্ধকার রাত্তিরে তো দিদি যেতে পারবে না। তুই তার চেয়ে এখন এখানেই শুয়ে পড়। কাল সকালে দিদি সেই তারা খসার জায়গাটায় যাবে।

আচ্ছা। বৃহি ভালমানুষের মতন কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ছেঁড়া চাদর বার করে ওই ডাইনিং স্পেসেরই একদিকের মেঝেতে পেতে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই নেশাতুরের নাকডাকার আওয়াজ শুরু হল। বুড়ির মেয়েদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে শারমিনও ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

৩

শুল ঠিকই, কিন্তু শারমিনের চোখে ঘুম এল না। পাগলের কথা এমনিতে কেউ ধরে না, কিন্তু বৃহির গলার ওই... হঠাৎ করেই জিনিসটার নামটা মনে পড়ে গেল সারমিনের, ‘মাইক্রোচিপ’... বৃহির গলার মাইক্রোচিপটাকে তো অস্বীকার করা যায় না। ওটা তর্কাতীতভাবে সুবর্ণযুগের চিহ্ন। আর ওই মোটা খাতাটা। ওটাতেই বা কী লেখা আছে কে জানে।

আচ্ছা... হঠাৎই বিছানায় সোজা হয়ে বসল শারমিন। ভাবল, আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করছি কেন? ঘুম যখন আসছে না, বৃহির ওই খাতাটা নিয়ে এসে পড়তে পারি তো।

শারমিন পা টিপে-টিপে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। সেই যে সন্ধেবেলায় ঝোরায় যাওয়ার সময় মীনা ওকে ফ্ল্যাশলাইটটা দিয়েছিল, সেটা আর ফেরত নেয়নি। সেই ফ্ল্যাশলাইটটা এখন অন্ধকারে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে বিশেষ কাজে লাগল ।

বুড়ি আর তার তিন মেয়েকে শারমিন কোথাও দেখতে পেল না। ওরা নিশ্চয় সারাদিন খাটাখাটনির পরে এখন নিজেদের ঘরে গভীর ঘুমে অচেতন। ডাইনিং-স্পেসের যেখানে বৃহি শুয়েছিল, সেখানে পৌঁছে সারমিন দেখল, সেও অচৈতন্যের মতন ঘুমোচ্ছে। বুকের ওপরে চিকচিক করছে সেই মাইক্রোচিপটা। শারমিনের একবার ইচ্ছে হয়েছিল, ওটা ওর গলা থেকে খুলে নেয়। তারপর ভাবল, ওটা তো এইমুহূর্তে কাজে লাগবে না। কখনোই লাগবে কিনা তারও ঠিক নেই। কাজেই ওটা থাক।

কিন্তু খাতাটার কথা আলাদা। কাগজের ওপর কালি দিয়ে লেখা, ও লেখা শারমিনের কাছে সহজবোধ্য। এবং লেখাগুলো শারমিনকে নতুন কিছু বলতে পারে। আর বেশি না ভেবে, শারমিন বৃহির মাথার কাছে রাখা ঝোলাটার মধ্যে থেকে বাদামি চামড়ায় বাঁধানো মোটা খাতাটা বার করে নিল।

ঘরে ফেরার পর মাথার কাছে বাতিটাকে উস্কে দিয়ে, শারমিন খাতাটা বুকের ওপরে খুলে বিছানায় আধশোয়া হল। মলাট উলটে দেখল, প্রথম পাতায় ছাপার অক্ষরে লেখা—

'Log Book. Space Cruiser Agnes. A.D. 2298.'।

স্পেস শব্দটার দিকে তাকিয়ে বজ্রাহতের মতন অনেকক্ষণ বসে রইল শারমিন।

ওর মনে পড়ল যে, আজ অবধি আদিবাসী লোককথা আর উপকথায় মানবসভ্যতার সুবর্ণযুগ নিয়ে যত গল্প শুনেছে, তাদের প্রত্যেকটিতে তখনকার মানুষের মহাকাশভ্রমণ বিষয়ে খুব ভাবগম্ভীর কিছু অংশ ছিল । কিন্তু এই খাতাটা খোলার আগে আগে অবধিও শারমিন ভাবত, ওগুলো রূপকার্থে বলা। অনেক উঁচু পাহাড় বোঝাতে গেলে যেমন বলা হয় 'আকাশছোঁয়া পাহাড়', তাই বলে কি সত্যিই কোনও পাহাড় আকাশকে

ছোঁয়? সেইরকমই, তখনকার মানুষ বহু দূরে দূরে ঘুরে বেড়াতো, এই কথাটা বোঝাবার জন্যেই হয়তো গানে-গল্পে বলা হয়, তারা নক্ষত্রের দেশে যেত।

কিন্তু এখন তো শারমিন বুঝতে পারছে, তারা সত্যিই পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে যাত্রা করত।

পরের কয়েকটা পাতায় তাড়াহুড়ো করে চোখ বুলিয়ে, শারমিন বুঝতে পারল, অ্যাগনেস নামক মহাকাশ যানের লগবুকটাকে তার চালক, জনৈক বার্সো শিনজা, নিজের ডায়েরি বানিয়ে নিয়েছিলেন। এত ঘরোয়া ভাষায় কোনও লগবুকই লেখা হয় না, সে এখনকার স্টিমারের লগবুকই হোক কিম্বা পাঁচশো বছর আগের মহাকাশযানের। এটা চেহারায় লগবুক হলেও, আসলে ডায়েরিই।

প্রথম এন্ট্রি তেরোই মার্চ, শনিবার, এ ডি ২২৯৮। সেইদিন সকালে প্যাঙ্গং বলে একটা জায়গা থেকে ক্রুজার-অ্যাগনেস মহাশূন্যে ভেসে যায়। এখনকার পৃথিবীতে প্যাঙ্গং নামের কোনও দেশ বা শহর নেই।

তারিখটা বুঝতে অসুবিধে হল না শারমিনের। এখনও বার এবং তারিখ ওইভাবেই গোনা হয়, বারোটা মাস, প্রতিমাসে তিরিশ, ঊনত্রিশ ত্রিশ কিংবা হয়, একত্রিশ দিন। বুঝতে তাই অসুবিধে নেই। কিন্তু সাল A.D. ২২৯৮। এই সালের উল্লেখটা সারমিন একেবারেই বুঝতে পারছে না। ওরা তো এখন বসন্তাব্দে বছর গণনা করে। Spring Year। এটা যেমন Spring Year ৪৯৫। বসন্তাব্দ ৪৯৫। আজ থেকে চারশো পঁচানব্বই বছর আগে, যেদিন পৃথিবীতে আবার একটা ক্যালেন্ডারের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, সেইদিন থেকে নতুন করে এই বছর গুনতি আরম্ভ হয়েছে।

পাতা ওলটালো শারমিন । দুটো পাতা পড়েও ফেলল খুব তাড়াতাড়ি এবং যা বুঝল তা হচ্ছে এই।

এগারোই মার্চ বিকেলের দিকে সম্রাট এই মর্মে আদেশনামা জারি করেছিলেন যে, আগেরদিন রাত্রি থেকে যে লাগাতার তুষারপাত শুরু হয়েছে, তার মধ্যে যেন কেউ কোনও মহাকাশযান নিয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছেড়ে যাত্রা না করে। (তার মানে তখন পৃথিবীতে একজন সর্বময় শাসক ছিলেন, যার নাম সম্রাট, ভাবল শারমিন)।

নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে সম্রাট বলেছিলেন, এই তুষার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক তুষার নয়। কুচকুচে কালো রঙের এই তুষার বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে। কাজেই এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেককে আদেশ করা হচ্ছে নিজের শহরে শুধু নয়, যার-যার ঘরের মধ্যে থাকতে। সেনাবাহিনী পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে।

পরদিন, মানে বারো-তারিখ ভোরবেলার লেজার-বুলেটিনে বলা হয়েছিল, যে-অজানা মহাজাগতিক মেঘের মধ্যে পৃথিবী ঢুকে পড়েছে, তার উৎস এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ওই মেঘের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীকে যেতে হচ্ছে বলেই পৃথিবীর বুকে এই বিপুল পরিমাণ তুষারপাত ঘটে চলেছে।

বিকেল গড়াতেই আর বুলেটিন শোনা বা শোনানোর মতন অবস্থায় রইল না কেউ। প্রয়োজনও ছিল না। কারণ ততক্ষণে প্রতিটি মানুষ কালো বরফের ধ্বংসলীলা নিজেদের অভিজ্ঞতাতেই বুঝতে পারছিল। বরফের চাপে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বিদ্যুতের তার এবং পানীয় জলের পাইপ। সড়কপথ, রেলপথ উড়োজাহাজ আর মহাকাশযানের বন্দরগুলিও কালো বরফের বিপুল ভারের নীচে অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

আবারও কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইল শারমিন। তাহলে সাধারণ তুষারযুগ নয়। মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল যে তুষার, তার রং ছিল কালো? এবং তা ছিল মহাকাশ থেকে আগত?

তারপর কী হল?

আবার পড়া শুরু করল শারমিন। স্পেস-পাইলট বার্সো শিনজা লিখেছে; এই ক্রুজারের মালিক তথা আমার গুরুদেব কিছুটা পাগল এবং প্রচুর খিস্তিবাজ হতে পারেন, কিন্তু তিনি একইসঙ্গে এই সময়ের সবচেয়ে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানী বললে যে ন্যালাখ্যাপা ইমেজটা মাথায় আসে মোটেই সেরকম নন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং ওপরমহলে বিশাল যোগাযোগ। তা না হলে কি আর সুপার কম্পিউটারের এই

পৃথিবীজোড়া বাণিজ্য গড়ে তুলতে পারতেন? যাইহোক, মোদ্দাকথা, বরফের প্রথম কুঁচিটা মাটিতে পড়ার সঙ্গেসঙ্গেই উনি অ্যালার্ট হয়ে গিয়েছিলেন।

আমাকে ডেকে বললেন, শিনজা! আমাদের হাতে একটা লেটেস্ট মডেলের স্পেস-এজার থাকতেও এখানে পড়ে পড়ে মরব কেন? চল, বেরিয়ে পড়ি।

ক্রুজারটার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা লিখে রাখা ভাল। চেহারায় একটা বিলাসবহুল পারিবারিক প্রমোদযানের মতন হলেও চরিত্রে এটি আমার গুরুদেবের ল্যাবরেটরি। গুরুদেবের পরিবার-টরিবার নেই, বান্ধবী আছে অগুন্তি । মাঝে-মাঝে তাদের নিয়ে এই যানে চড়ে কাছাকাছি ট্রিপ মেরে আসেন । তখনও আমাকেই এটা নেভিগেট করতে হয়। আবার যখন উনি নিশ্চিন্তে কাজ করার জন্যে মহাশূন্যে ভেসে পড়েন তখনও সঙ্গে শুধু আমিই থাকি ।

সেইজন্যেই আমি জানি যে, এই ক্রুজারের পেটের ভিতরে এমন অনেক কলকব্জা রয়েছে যেগুলোর কথা গুরুদেব এখনও কাউকে জানাননি। শুধু আমাকেই কিছুটা জানিয়ে রেখেছেন।

যেমন Guiding Omnipotent Device । সংক্ষেপে GOD।

ঈশ্বরই বটে। এরকম সুপার কম্পিউটার আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। একদিন গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন, বুঝলি শিনজা, গত পঁচিশ বছর ধরে আর যাকিছু আবিষ্কার করেছি, সবই এই গড়ের জন্যে প্রস্তুতি। কি বিপুল পরিমাণ অর্থ আর পরিশ্রম যে এর পেছনে ব্যায় করেছি, সে শুধু আমিই জানি।

আমাকে উনি গড়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য সবসময় যে কথা বলতে হত তাও নয়। থট-রিডিং জানত গড়। সোজা বাংলায় মন পড়তে পারত। তাছাড়া গড আদতে একটা মেশিন হলেও মানবসভ্যতার জন্যে ছিল বলিপ্রদত্ত।

আমি কিছুদিন আগে একবার গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই মানুষের জন্যে জান দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা ওর সিস্টেমের মধ্যে ঢোকালেন কেন ?

গুরুদেব উত্তর দিয়েছিলেন, কে জানে। সব কাজই কি আর অত ভেবেচিন্তে করি? তবে মনে হল, এই যে হাজার বছরের জ্ঞান-বিজ্ঞান- শিল্প-সংস্কৃতি আমাদের; যদি কোনওদিন এলিয়েন অ্যাটাক হয়? অন্য গ্রহের প্রাণীরা যদি পৃথিবী আক্রমণ করে? তাহলে তো এই সবকিছুই একদিনে হাওয়া হয়ে যাবে। তাহলে কোথাও কি এই সবকিছু স্টোর করে রাখা উচিত নয়?

আবার দেখ, শুধু স্টোর করলেই তো হল না। সেই স্টোরেজ মেশিন যদি নিজেকে নিজে রক্ষা করতে না পারে, তাহলে লাভটা কী? এইসব ভেবেই বানিয়ে ফেললাম এই গাইডিং অমনিপোটেন্ট ডিভাইস।

এখন ভাবছি, গুরুদেব গডকে পৃথিবীর মাটিতে না রেখে ক্রুজারের মধ্যে রেখেছিলেন কেন? উনি কি তাহলে এরকম একটা সিচুয়েশনও কল্পনা করতে পেরেছিলেন, যেখানে পৃথিবীতে থাকাই চলবে না, বেরিয়ে পড়তে হবে?

নিশ্চয়ই তাই।

সেইজন্যেই কালো বরফের প্রথম কুচিটা আকাশ থেকে ঝরামাত্রই উনি আমাকে ডেকে বললেন, শিনজা, যঃ পলায়তি সঃ জীবতি, কথাটা শুনেছিস ? তোর তো বালবাচ্চা নেই, আমারও নেই। চল কেটে পড়ি। গুরুদেবের কথা আমার কাছে বেদবাক্য। ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে দুজনে ভেসে পড়লাম। শারমিন পাতা ওলটাল। এরপর আবার পনেরোই মার্চের এন্ট্রি।

কিছুই বুঝতে পারছি না। এই যে এইভাবে পালালাম, আশঙ্কা করেছিলাম, কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্নিং আসবে। এমনকি পেছনে স্কাই-ওয়ে পেট্রলের গাড়িও তাড়া করে আসতে পারত। কিন্তু কিছুই হল না। গোটা একটা দিন অপেক্ষা করার পরে নিজেই কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। সব শ্মশানের মতন শান্ত।

তারপর চেষ্টা করলাম আমাদের এজেন্সীর অন্য পাইলটদের সঙ্গে কথা বলার। কেউ ফোন ধরল না। শুধু গোমতুর ফোনটা ধরল ওর বউ। গোমতুর বাড়ি গিয়ে অনেক আড্ডা মেরেছি এককালে। ওর বউকে ভালো করেই চিনতাম। সে আমার গলা শুনে অবাক। বলল, আপনি ঠিক আছেন! কথা বলতে পারছেন! কেমন করে? আমি বললাম, কেন? গোমতু পারছে না? তাতে মেয়েটা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। আর কিছু না বলেই ফোনটা কেটে দিল।

বুঝতে পারলাম, কোনও পুরুষমানুষকে আর ফোন করে লাভ নেই। তাই ফোন করলাম শীলাকে, আমার বান্ধবীকে। দেখি ভয়ে ওর গলা কাঁপছে । বলল, একদিকে পাহাড়প্রমাণ কালো-বরফের স্তূপ শহরগুলোকে গুঁড়িয়ে দিতে দিতে এগিয়ে আসছে আর অন্যদিকে যত বেটাছেলে সব নাকি নির্বোধের মতন আচরণ করছে। আমি বললাম, তুমি তো বরাবরই বেটাছেলেদের নির্বোধ বল। ও বলল, উঁহু, সেরকম নির্বোধ নয়। গরু-ছাগলের মতন নির্বোধ। কিংবা তার চেয়েও খারাপ। কথা বলতে ভুলে যাচ্ছে, জামা-প্যান্ট পরতে ভুলে যাচ্ছে। আমি বললাম, সেকি! এরকমটা কি শুধু আমাদের পাড়ায় হচ্ছে? ও বলল, ধুৎ, আমাদের পাড়ায় কেন? সারা পৃথিবীতে। সম্রাটকেও নাকি তাঁর স্ত্রী হাতে করে খাইয়ে দিচ্ছেন।

শারমিন বুঝতে পারল, পড়তে-পড়তে তার ঘাড়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই পুরুষেরা একদিন এতটাই পারত! একজন পুরুষ মহাকাশযান চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! আর একজন পৃথিবী শাসন করছে, এই সীডারগুলো এতটাই গুণবান ছিল !

শারমিন আবার ডায়েরির পাতায় মন দিল।

পরের কয়েক-পৃষ্ঠায় শুধুই ক্রুজারের মালিকের সঙ্গে শিনজার ঝুটঝামেলার বিবরণ। তারপর আবার উল্লেখযোগ্য এন্ট্রি উনিশে মার্চ।

কাল সারারাত শীলার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, পারিনি। আজ সকালে ঠিক দু-মিনিটের জন্যে ওর কানেকশান পেয়েছিলাম। ও বলল, তিনদিন আগে দুটো বিস্কিট খেয়েছিলাম। তারপর খাবার শেষ, শুধু আমার নয়, সবারই। জল বলতে কালো বরফ গলা জল। বিস্বাদ, খেলেই পেটে মোচড় দিচ্ছে। বরফের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছি আর পালাচ্ছি। কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও বুকে হেঁটে। যাদের স্বামী আছে, প্রেমিক আছে, পুরুষ সন্তান আছে তারা ওই অবস্থাতেই চেষ্টা করছে তাদের কোনওভাবে টেনে-হিঁচড়ে সঙ্গে নিয়ে আসতে। পারছে না যদিও। অবোধ পশুর মতন ওরা মুখে দুর্বোধ্য আওয়াজ করছে আর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে এগিয়ে-আসা বরফের স্রোতের দিকে। পালানোর কোনও চেষ্টাই নেই।

শীলা বলল, তুমি ফোন করলে ভালই হল। একবার শেষবার গলাটা শুনতে পেলাম ।

তারপরেই কানেকশন কেটে গেল। পৃথিবীর কারুর সঙ্গেই তারপরে আর যোগাযোগ করতে পারিনি। গুরুদেব লোকটা খুব কুল। বলল, শিপটাকে ফেরত নিয়ে চল। যা বুঝছি, পৃথিবীতে এখন আমাদের প্রয়োজন । বাকি সব বেটাছেলে তো বাউড়া হয়ে গেছে।

সারা পৃথিবীর কথা ভাববার মতন মনের জোর আমার নেই। কিন্তু শীলার জন্যে বিলক্ষণ মন কাঁদছিল। ঘুমোতে পারছিলাম না। চোখ বুজলেই দেখতে পাচ্ছিলাম, রোগা মেয়েটা তীব্র ঠান্ডায় আর দুঃসহ খিদেয় কাঁপতে কাঁপতে কোনওরকমে শরীরটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওর পেছন পেছন তাড়া করে আসছে কুচকুচে কালো এক বরফের পাঁচিল । বাতাসের সঙ্গে সেই বরফ-পাঁচিলের সংঘাতে মেঘ ডাকার মতন গুমগুম আওয়াজ উঠছে। আমারও তাই পৃথিবীতে ফিরে যেতে কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু পারলাম না।

যে-কোনো স্পেস-শীপের ক্ষেত্রেই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ঢুকবার সময় অ্যাঙ্গেল-অফ-এন্ট্রিটা সেট করে দেয় কন্ট্রোল-টাওয়ার। আমাদের ক্রজারও তার ব্যতিক্রম নয়। এই প্রথম নিজে ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে অ্যাঙ্গেল ভুল করে ফেললাম। স্যাটেলাইট হয়ে গেলাম পৃথিবীর। এবার অনন্তকাল পৃথিবীকে ঘিরে পাক খাবো, যদি না পৃথিবী নিজে কখনো এদিক-ওদিক সামান্য হেলে যায়। কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করলাম। সে উত্তর দিল, এখন অন্তত পাঁচশো বছরের মধ্যে সেরকম ঘটনা ঘটার চান্স নেই।

গুরুদেবকে বললাম সে-কথা। উনি থিয়োরিতে মাস্টার হলেও কলকব্জার ব্যাপারটা আমার মতন ভাল বুঝতেন না। আমার কথার উত্তরে যা বললেন, তাতে আবারও বুঝলাম, ওঁর ব্রেনটাই শুধু বড় নয়, দিলটাও বিশাল। বললেন, শিনজা, শোন। তুই জানিস, এই ক্রুজারে ক্রায়োজিনিক- বেড রয়েছে। সেটার মধ্যে ঢুকলে তোকে জমিয়ে বরফ করে দেবে। তোর যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। মরার মতন পড়ে থাকবি, কিন্তু আসলে মরবি না ।

আমি কিছু না বলে ওঁর কথা শুনছিলাম। ক্রায়োজিনিক বেড যে রয়েছে সেটা আমি জানব না তো কে জানবে? আমি তো এই ক্রুজারের ক্যাপ্টেন। কিন্তু এর পর উনি কী বলেন সেটাই ভাইটাল ।

গুরুদেব বলে চললেন, তুই যদি অটো-কন্ট্রোলকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখিস যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকা মাত্র তোকে হিমায়িত অবস্থা থেকে মুক্ত করে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে, তাহলে এ.সি. ঠিক সেটাই করবে। তা সে দু-হাজার, তিন-হাজার যত বছর বাদেই হোক না কেন।

এই বলে গুরুদেব আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমি বললাম, তাহলে আর কী? ঢুকে পড়ুন ।

গুরুদেব বললেন, পাগলা নাকি রে তুই!

আমি খচে গেলাম। বললাম, বেফালতু গালাগাল করছেন কেন বলুন তো। আপনি এই স্পেস-শিপের মালিক। বাঁচার অধিকার কার বেশি? আপনার না আমার?

গুরুদেব বললেন, অধিকারের একশো-আটবার গাঁড় মেরেছে। আরে গান্ডু, আমি তো এই এজারটাকে চালাতেই জানি না । তুই নিশ্চয় বলবি এ.সি. চালিয়ে নেবে। কিন্তু তার জন্যে এ.সিকে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে তো। আমি তো সেটাও পারি না। তাহলে আমি হিমঘুম ভেঙে কী করব? পোর্ট-হোল দিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখব, কি সুন্দর আমাদের স্পেসক্র্যাফট জ্বলতে জ্বলতে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ছে? দু-সেকেন্ডে ঝলসে ছাই হবার জন্যে দু-হাজার বছর বেঁচে থাকব ?

ভেবে দেখলাম কথাটা ঠিক। যদি আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকেই ক্রায়োজিনিক-বেডের সাহায্যে বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে আমার বাঁচাটারই কিছু মানে থাকে। ওঁরটা নয়। তবু গুরুদেব আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে নিজে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, এটা ভাবতেই আমি শিউরে উঠলাম।

ইতিমধ্যে কন্ট্রোল প্যানেলের অক্সিজেন-মিটারের কাঁটা ক্রমশ সবুজ থেকে কমলার দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল। সেই কাঁটাটার দিকে চোখ রেখে আমরা শুকনো খাবার দিয়ে ডিনার সারলাম। খেতে-খেতে গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন, শিনজা, তুই তো অনেক কিছু জানিস। পৃথিবীর এবং মহাবিশ্বের অনেক বৈজ্ঞানিক-তথ্যই তোর নখদর্পণে। তুই কি বুঝতে পারছিস, কোথা থেকে মানবজাতির কপালে এই সর্বনাশ ঘনিয়ে এল। কালো বরফ জিনিসটা কী? কেন পুরুষদেরই শুধু মানসিক পক্ষাঘাত হচ্ছে?

মানসিক পক্ষাঘাত। এর চেয়ে নির্দিষ্টভাবে বোধহয় সিচুয়েশনটাকে ডেসক্রাইব করা যেত না। আমি আড়চোখে মালিকের দিকে তাকালাম। এই অসাধারণ ইনটেলিজেন্ট, অসাধারণ হৃদয়বান লোকটার আয়ু আর কয়েক ঘন্টা? হতে পারে না। আমি ক্ষোভে দুঃখে খাবারের থালাটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেললাম। জিরো-গ্র্যাভিটি পরিবেশে সেটা ক্রুজারের ছাদের কাছে গিয়ে ভাসতে লাগল। বললাম, না বস। আমি রাজি নই। আপনি ক্রায়োজেনিক বেডে ঢুকুন। আপনি বাঁচুন। পরে যা হবে দেখা যাবে।

গুরুদেব হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা চেপে ধরল। বলল, শিনজা, শুয়োরের বাচ্চা, পাগলামি করিস না। একটা জিনিস বুঝতে পারছিস না? দুদিন আগে অবধি আমরা দুজনেই ছিলাম একহাজার কোটি হোমো স্যাপিয়েন্সের মধ্যে এলেবেলে দুজন। নদীর তীরে ছড়িয়ে থাকা কোটি-কোটি নুড়িপাথরের মধ্যে দুটো নুড়ি-পাথরের যা দাম তার চেয়েও সস্তা ছিল আমাদের অস্তিত্ব। কিন্তু আজ আমরা নুড়ি থেকে হিরে হয়ে গেছি। কেন বুঝতে পারছিস?

কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কারণ, আমরা দুজনই একমাত্র পুরুষ যারা কালো-বরফের বিষের হাত এড়িয়ে পালাতে পেরেছি। সম্ভবত এই-মুহূর্তে আমরাই শেষ স্বাভাবিক পুরুষ, যাদের চিন্তা চৈতন্য অটুট রয়েছে। তাই আমাদের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়াটা এত জরুরি। ভাল হত যদি দুজনেই ফিরতে পারতাম। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব হচ্ছে না তখন তুই-ই ফের কেন? আমিই কেন? গোঁয়ারের মতন আবার তর্ক জুড়লাম। আসলে আমার মাথায় তখন আরেকটা চিন্তার উদয় হয়েছে। গুরুদেব লোকটা সত্যিই কি নেভিগেশনের অ-আ-ক-খ জানে না? এতটা উদো কি হতে পারে কেউ ? নাকি মালটা আমাকে বাঁচানোর জন্যে মিথ্যে কথা বলছে?

গুরুদেব তীব্রদৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা কারণ তো তোকে আগেই বলেছি; আমি অটো কন্ট্রোলকে ইন্সট্রাকশন দিতে পারি না। আরেকটা কারণ, আমার বয়স পঁয়ষট্টি বছর আর তোর তিরিশ। তো?

বুঝলি না? এই ক্রায়োজিনিক বেড়ের ধকল একজন মানুষের বয়স অন্তত দশ বছর বাড়িয়ে দেয়, সেটা জানিস নিশ্চয়। ভিতরের কলকব্জা লজঝড়ে করে দেয়। তাহলে পঁচাত্তর বছরের বুড়ো হয়ে পৃথিবীতে পৌঁছিয়ে আমি কোন বালটা ছিঁড়ব তুই আমাকে বলতে পারিস। আমার হুইল-চেয়ার ঠেলবার জন্যে কোন নাঙ অপেক্ষা করবে?

তারপর মুখটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, দুনিয়ায় নিজের বলতে ছিল আমার মা। সে বুড়ি মারা গেছে পাঁচ বছর আগে। তার জন্যে আমার খুব মনকেমন করছে। শিনজা, সোনা আমার। আমাকে মায়ের কাছে যেতে দে, তুই আর বাধা দিস না। আমি বেরোই। তুইও চুপচাপ ঠান্ডা-বাক্সে ঢুকে পড়।

আমরা দুজনে শেষবার এক গ্লাস করে ওয়াইন খেলাম। জোর করে আমার গ্লাসে নিজের গ্লাস ঠুকে গুরুদেব একগাল হেসে বললেন, চিয়ার্স। তারপর চোঁওও করে একচুমুকে পুরো গ্লাসটা শেষ করে দিয়ে এগজিট হ্যাচের ভেতরে ঢুকে পেছনের ভাল্ব-ডোরটা বন্ধ করে দিলেন। আমি কাচের পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে তখনও ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম পিঠের ছোট প্রপেলার রকেট দুটোকে অ্যাডজাস্ট করছেন আমার গুরুদেব। ওই দুটো রকেটই ওঁকে ঠেলে দূরে পাঠিয়ে দেবে। তা নাহলে এই ক্রুজারের গ্র্যাভিটির টানে ওর মৃতদেহটা ক্রুজারের সঙ্গে সঙ্গে চলবে এবং সেটা খুব সুন্দর দেখতে লাগবে না।

আমি নিশ্চিত হলাম, ভদ্রলোক এই ক্রজারের হাল-হকিকৎ খুব ভাল করে জানেন। হয়তো আমি আসার আগে নিজেই এটাকে চালাতেন। স্রেফ আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আজ ঢপ মারলেন। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। খুব আস্তে একটা ফ্লপ আওয়াজ। পরমুহূর্তে দেখলাম একজিট হ্যাচ ফাঁকা; বাইরের অতল অন্ধকারে রকেট-ফিউমের দুটো সাদা রেখা একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল ।

এবার আমি অটো-কন্ট্রোলের হাতে ভবিষ্যতের ভার দিয়ে ক্রায়োজিনিক- বেডে শুয়ে পড়ব। আর কখনও জাগব কি না জানি না। তাই এই লগবুকেই পুরো ঘটনাটা লিখে রাখলাম।

শারমিন ভেবেছিল ডায়েরি এখানেই শেষ। কিন্তু পাতা ওলটাতেই তার মাথায় বাজ পড়ল। দেখল টাটকা কালিতে লেখা আছে, সম্ভবত পৃথিবীর অক্ষরেখার ঢালে সামান্য হেরফের হয়ে থাকবে, অতএব আমার ঘুমের মধ্যেই ক্রুজার ঢুকে পড়েছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে। তারপর যা করার গড় করেছে। নিরাপদে ক্রজারকে ফিরিয়ে এনেছে পৃথিবীতে। আমাকে ডিপফ্রিজে রাখা চিকেনের মতন ডিফ্রস্ট করেছে।

কতবছর ঘুমোলাম ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে উঁকিঝুঁকি মেরে চারিদিকে যা দেখছি, তা মনটাকে দমিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সভ্যতার চিহ্ন বলে কোথাও কিছু নেই।

গতকাল একটা পাগলাটে মেয়েকে দেখছিলাম এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুশকিল হচ্ছে, ক্রুজারের দরজার লকটা গেছে খারাপ হয়ে। আমি না থাকা কালীন ভিতর থেকে কিছু গেঁড়িয়ে না দেয়।

৪

বুকের ওপরে লগবুকটাকে নামিয়ে রেখেই শারমিন কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ওর ঘুম ভাঙল, তখন জানলার কাচের ওদিকে আকাশটা ফরসা হয়ে উঠেছে। পাখির ডাকের সঙ্গে একসঙ্গেই ভেসে আসছে

নীচের কিচেন থেকে বাসন-কোসনের ঠুংঠাং আওয়াজ। তার মানে বুড়ির মেয়েরাও কাজে লেগে গেছে।

যদিও রাতের ঘুমটা পুরো হয়নি, চোখদুটো জ্বালা করছিল, তবু শারমিন শয্যাত্যাগ করল। করতে বাধ্যই হল বলা চলে, কারণ, না হলে বৃহি পাগলি আবার কখন বেরিয়ে যায় কে জানে। ওকে তো বৃহির সঙ্গে যেতে হবে সেই পুরুষটির খোঁজে। যার বয়স পাঁচশো বছরের বেশি আর নাম যার বার্সো শিনজা।

হাত মুখ ধুয়ে নীচে নেমে আসতেই রান্নাঘরের দিক থেকে বুড়ির গলার আওয়াজ ভেসে এল, শারমিন বেটি। এদিকে এসো। রুটি-তরকারি হয়ে গেছে, খেয়ে নাও।

রান্নাঘরে ঢুকে চেরা পাইনকাঠের টেবিলে বসতেই জিনা ওর সামনে ধোঁয়া-ওঠা সবজি আর রুটির থালা রেখে দিয়ে একগাল হাসল। শারমিনের বেশ খিদে পেয়েছিল। কোনও কথা না বলে খাবারটা শেষ করল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, বৃহি কোথায়? তাকে দেখছি না।

রাবিনা বলল, ও তোমার ওপরে খুব রেগে গেছে। বলছিল তুমি নাকি ওর কোন খাতা ঘুমের মধ্যে তুলে নিয়ে গেছ।

শারমিন অবাক চোখে রাবিনার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ফেরত দিয়ে দিতাম তো। এই দেখো, ফেরত দেবার জন্যেই নিয়ে এসেছি। ও গেল কোথায় ?

কি জানি। ও যে কোথায় যায় কাউকে বলে যায় কি? রাগে গজগজ করতে-করতে বেরিয়ে গেল।

শারমিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ আগে ও বেরিয়েছে, রাবিনা? ওকে যে আমার ভীষণ প্রয়োজন ।

তারপর কোনওরকমে এঁটো হাতটা ধুয়ে, জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, তোমাদের মধ্যে একজন কেউ আমার সঙ্গে যাবে? আমাকে একটু বৃহির আস্তানাটা দেখিয়ে দেবে?

কথাটা বলেই শারমিন বুঝতে পারল অন্যায় আবদার করে ফেলেছে। সকাল থেকে দুপুর অবধি এই সময়টায় মিনা জিনা রাবিনার মরার সময় থাকে না। অতগুলি খনিশ্রমিকের খাবারের আয়োজন করা, সে কি মুখের কথা? সেইজন্যেই শারমিনের অনুরোধ শুনে ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

শেষ অবধি মিনা একটু 'কিন্তু কিন্তু' করে বলল, দিদি, আমরা কেউ না থাকলেও তোমার উত্তরের টিলা অবধি চলে যেতে কোনও অসুবিধে হবে না। ওখানেই কোথাও একটা থাকে বৃহি।

শারমিন বলল, কিন্তু টিলাটা তো আর ছোট্ট একটু জায়গা নয়। তার মধ্যে ঠিক কোথায় বৃহি থাকে, বুঝব কেমন করে?

জিনা বলল, সে তো আমরাও জানি না, দিদি। মনে হয় কোনও একটা জায়গায় ও থাকেও না। আজ এখানে, কাল ওখানে ঘুরে ফিরে কাটায়। থাকার জায়গার তো অভাব নেই... পুরো টিলাটাই মৌচাকের মতন ঝাঁঝরা । কাজেই আমরা সঙ্গে থাকলে তোমার কোনও বাড়তি সুবিধে হবে না ।

বুড়ি মালকিন এতক্ষণ সরাইখানার পেছনের উঠোনে বেঁধে রাখা ছাগীগুলোর দুধ দোয়াচ্ছিল। এবার দু-হাতে দু-ঘটি দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকে বেশ অসন্তুষ্ট-মুখে সারমিনকে জিজ্ঞেস করল, তা তুমিই বা ওই টিলায় যেতে চাইছ কেন বাছা? সবাই জানে জায়গাটা ভূতুড়ে, অভিশপ্ত। বৃহির মতন ভূতে পাওয়া মেয়ের পক্ষেই ওখানে থাকা সম্ভব। ওকে শয়তান রক্ষা করেন। কিন্তু তোমাকে কি তিনি তা করবেন ?

শারমিন নিজের ব্যাকপ্যাকটা পিঠে তুলে নিয়ে সরাইখানা থেকে বেরোতে বেরোতে বলল, 'কোয়েস্ট' মাসিমা। খোঁজ। ওটাই যে আমার চাকরি। যেতে তো আমাকে হবেই।

শারমিন গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঠঘাট ভেঙে উত্তরদিকে রওনা হল। সামনে তাকালেই দিব্যি দেখা যাচ্ছিল, ওদিকে একটা ছোট টিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। টিলাটার উচ্চতা খুবই কম, কিন্তু পুবে পশ্চিমে প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার ছড়ানো।

টিলাটাকে নিয়ে শারমিনের মনে একটা ধাঁধা তৈরি হয়েছিল । দক্ষিণের বিশাল পর্বতশ্রেণি থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে নদীর দিকে নেমে গেছে ইলিয়ানা উপত্যকা। সেক্ষেত্রে হঠাৎ পাহাড়ের সম্পূর্ণ বিপরীতদিকে ওই

সৃষ্টিছাড়া টিলাটা কেমন করে গজিয়ে উঠল, বুঝতে পারছিল না শারমিন। এর উত্তরটা সে পেয়েছিল আরও কিছু পরে।

ওই টিলাটাকে লক্ষ করেই হাঁটতে শুরু করেছিল সারমিন। হাঁটতে-হাঁটতে সে অল্প সময়ের মধ্যেই ইলিয়ানা গ্রাম পেরিয়ে গেল। এখন আর পায়ের নীচে পাথর বাঁধানো রাস্তা নেই। ও হাঁটছিল জমির আল ধরে। রোদ ক্রমশ বাড়ছিল। কৃষাণীরা সারি বেঁধে চাষের কাজে মাঠে চলেছিল। তাদের সামনে দু-চারটি বলদ, পেছনে খোজা করা দু-চারটি পুরুষ। সারমিন খেয়াল করে দেখেছে, সব জায়গাতেই ওরা এইভাবেই রাস্তা চলে। সামনে থাকে বলদগুলো, কারণ সেগুলো মাঝেসাঝে অবাধ্যতা করে। তাই তাদের দিকে নজর রাখতে হয়। কিন্তু খোজা করা পুরুষেরা এতটাই অনুগত হয় যে, তাদের দিকে নজর না রাখলেও চলে। কৃষাণীরা চললে ওরা চলে, থামলে থামে। তাই ওরা থাকে দলের পেছনে।

শারীরিক পরিশ্রমের কাজে যে-পুরুষদের ব্যবহার করা হয়, তারা স্বভাবতই নিরীহ এবং বাধ্যপ্রকৃতির। তবু তাদের খোজা করতে হয় কেন, এ ব্যাপারে একসময় শারমিনের মনে কৌতূহল জেগেছিল। খোঁজ নিয়ে সে যা জেনেছিল, তা হল, গৃহপালিত পুরুষদের খোঁজ করতে হয় মেয়েদের জন্যে। কামাতুর মেয়েরা চাষের কাজে ব্যবহৃত নির্বোধ পুরুষগুলোর সঙ্গে সঙ্গম করে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে এমন ঘটনা একসময় প্রচুর ঘটেছে।

ওইধরনের মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মাত, তারা ঠিক উঁচুমানের হত না। আরও নানান অসুবিধে ছিল। ব্যাভিচারী মেয়েগুলো কর্মী-পুরুষদের সঙ্গে ইমোশনালি জড়িয়ে পড়ত, ওদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সময় কান্নাকাটি করত। তাই এখন আইন করে দেওয়া হয়েছে, একমাত্র সীড-ফার্মের জন্যে বাছাই করা পুরুষ ছাড়া অন্য সব পুরুষ-শিশুকে আট বছর বয়স হলেই খোজা করতে হবে। তাদের লাগানো হবে শ্রমিকের কাজে।

শারমিন দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ একটানা চড়াই ভাঙার ফলে ওর একটু হাঁপ ধরছিল। রুমাল দিয়ে কপাল আর গলার ঘাম মুছতে-মুছতে ও দেখল, এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খেতগুলোতে এখন ফসল কাটার পালা শুরু হয়েছে। পুরুষেরা মাথা নিচু করে একমনে খসখস করে যবের গোছা কেটে চলেছে। পেছন-পেছন মেয়েরা সেই কেটে-ফেলা গাছগুলোকে গুছি করে বাঁধতে বাঁধতে এগোচ্ছে।

সে নিজের মনেই বলল, যবের শিষ দিয়ে আঁটি বাঁধতে গেলে আঙুলের যে মোচড়টুকু লাগে, বহুবছরের চেষ্টাতেও পুরুষদের সেটা শেখানো যায়নি। যাবেও না। অগত্যা ওদের সঙ্গে মেয়েদের থাকতেই হয় ।

ও আবার হাঁটতে শুরু করল। প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক হাঁটার পরে পৌঁছে গেল উত্তরের পাহাড়ের পায়ের কাছে। কিছুটা চড়াই ভাঙার পরেই শারমিন দেখল সামনে ঘন জঙ্গল শুরু হয়েছে এবং একটা সরু পায়ে চলা পথ সেই জঙ্গল ভেদ করে পাক খেতে-খেতে পাহাড়চূড়ার দিকে উঠে গেছে।

এটাই গ্রামের লোকেদের চলাচলের রাস্তা। শারমিন জানে এই রাস্তার ধারেকাছে কোথাও বৃহি থাকবে না। ও তো গ্রামবাসীদের চোখের আড়ালেই থাকতে চায়। শারমিন তাই ঠিক করল, সে ওই পায়ে-চলা পথ ধরে হাঁটবে না। অন্য কোনও দিকে বৃহির আস্তানা খুঁজে দেখবে।

কিন্তু এত বড় টিলার কোনখানে সে বৃহিকে খুঁজবে?

আরো কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে সারমিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, সাধিকা বা উন্মাদিনী যাই হোক, বৃহি আসলে একটি রোগাভোগা মেয়ে । সম্পূর্ণ পথহীন অরণ্য ভেদ করে চলাফেরা করা তার পক্ষে শারীরিকভাবেই অসম্ভব। তার একটা তৈরি-রাস্তা চাই ।

ছাত্রী অবস্থায় আর্কিওলজির ফিল্ড-ট্রেনিং-এর দিনগুলোতে শারমিন এমন অনেক অরণ্য দেখেছে। সে জানে, জনমানবহীন জঙ্গলেও চলাচলের দুটো রাস্তা তৈরিই থাকে, এক জন্তু-জানোয়ারের পায়ে-পায়ে গড়ে ওঠা শুঁড়িপথ। আর নাহলে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা ঝোরা বা নদীর তীরভূমি। এখানেও একটু দূর থেকে পাথরের ওপর দিয়ে জল বয়ে যাওয়ার ঝরঝর শব্দ ভেসে আসছিলো। ঝোপঝাড় ভেঙে শারমিন ঠিক

সাড়ে-সাত মিনিটের মাথায় সেই ঝর্নাটার ধারে পৌঁছে গেল এবং দেখে খুশি হল যে জলধারার দুদিকেই একজন মানুষের হেঁটে যাওয়ার পক্ষে দিব্যি চওড়া এবং পরিষ্কার তীরভূমি রয়েছে। সারমিন রিস্টওয়াচে সময় দেখল, মাত্র সকাল নটা। এখনও হাতে অনেকটাই সময় রয়েছে। ও ডানদিকের রিভার-ব্যাঙ্ক ধরে হাঁটতে শুরু করল।

হাঁটতে শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারী আশ্চর্য কিছু উপলব্ধি হল সারমিনের। এক, এই ঝোরাটার গতিপ্রকৃতি ঠিক সাধারণ পাহাড়ি ঝোরার মতন নয় । সাধারণ পাহাড়ি ঝোরাগুলো টিলার মাথা থেকে নীচে নেমে আসে, আর এই ঝোরাটা টিলার পায়ের কাছ থেকে শুরু হয়ে আরও নীচে চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই টিলার নীচে লুকোনো কোনও পাতালের দিকে এর অভিমুখ ।

দুই, এই ঝোরার দুদিকের উঁচু পাড় শুধুই মাটি আর পাথর দিয়ে তৈরি নয়, মাঝে-মাঝে স্পষ্ট লোহা আর কংক্রিটের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো শারমিন। খুব ভাল করে চারদিক খুঁটিয়ে দেখে তার আর সন্দেহ রইলো না যে, সে এক মানুষের তৈরি স্ট্রাকচারের ভগ্নাবশেষের মধ্যে ঢুকে পড়ছে।

একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত হল। উত্তরের এই টিলা আদৌ কোনও প্রাকৃতিক টিলা নয়। এটা আসলে একটা বিশাল নগরীর ভগ্নাবশেষ। এই ভগ্নাবশেষের ওপরে স্তূপ হয়ে জমেছে হিমবাহের বয়ে আনা পাথর।

এমন কি হতে পারে, মনে-মনে ভাবলো শারমিন, এই শহরের নামই ছিল প্যাঙ্গং। চালকহীন ক্রুজার-অ্যাগনেস যেদিন পৃথিবীতে ঢুকতে পেরেছে, সেদিন সে পুরনো প্রোগ্রাম মেনে নিজের শহরে, নিজস্ব ল্যান্ডিং-স্ট্রিপেই ফিরে এসেছে।

হতেই পারে। যুক্তি বলছে বার্সো শিনজার কঙ্কালটারও এতদিনে ধুলো হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়া উচিত। কিন্তু ওদিকে আবার লগবুকের শেষ পাতাটায় যা লেখা আছে তাকেই বা উড়িয়ে দেয় কেমন করে? তাছাড়া বৃহির ওই রুপোলি ঘর আর তার ভিতরে রুপোলি পোশাকের মানুষের গল্প; সেটাও তো স্পেসশীপের ভিতরে একজন মানুষের উপস্থিতির কথাই বোঝাচ্ছে।

আরও ঘণ্টাখানেক এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোর পরে শারমিন নিশ্চিত হল যে, তার অনুমানই ঠিক। এই টিলাটার নীচে চাপা পড়ে আছে কালো-বরফের চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া একটা আস্ত নগরী। পাঁচশো-বছর আগে বরফ গলে যাওয়ার পরে আবার যা প্রকাশিত হয়েছে। সেই নগরীর থেকে অনেকটা দূরে ছিল ওই ইলিয়ানা গ্রাম আর তার মাথার কাছে পাহাড়, তার গন্ধকের খনি। অলৌকিক ভাবে যে গ্রাম, যে-খনি কালো-বরফের ছোবল থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তবু রক্ষা পায়নি সেই গ্রামের পুরুষেরা। কেন? এটা এখনও শারমিনের কাছে এক রহস্য । কালো বরফ মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল। পুরুষদের মস্তিষ্ককে ধ্বংস করেছিল কে?

এইসব ভাবনার মধ্যে থেকেই হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে যেন বাস্তবের মাটিতে ফিরে এল শারমিন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটা আওয়াজ শুনছিল সারমিন। চারিদিক এত নিঃশব্দ বলেই আওয়াজটা ওর কানে বেশি করে বাজছিল। মাঝে-মাঝে স্পষ্ট হচ্ছিল আওয়াজটা, মাঝে-মাঝে হাওয়া অন্যদিকে বাঁক নিলে হারিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই আওয়াজটা একদম কাছে ঘনিয়ে এল, সারমিন যে পাকদণ্ডী রাস্তাটা ধরে হাঁটছিল, ঠিক তার নীচের বাঁক থেকে খড়মড় খড়মড় করে শব্দ উঠল। বুঝতে অসুবিধে হল না, একদল মানুষ কিংবা পশু শুকনো পাতা মাড়িয়ে এই পাকদণ্ডী বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। শারমিন তার জ্যাকেটের নীচের হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বার করে হাতে নিল। তারপর চট করে রাস্তার ধারে একটা বড় ঝোপের আড়ালে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ।

মিনিট খানেকের মধ্যেই ওদের দেখা গেল। না, জন্তু নয়, মানুষ । চোদ্দো থেকে চল্লিশ বছর বয়সি চারটি মেয়ে রাস্তার বাঁক ঘুরে এগিয়ে এল। তখনও ওদের পায়ের নীচে শুকনো পাতা দলে যাওয়ার শব্দ হচ্ছিল।

ওরা কৃষাণী। হাঁটু অবধি গুটিয়ে রাখা মোটা কাপড়ের প্যান্ট, ঘামে ভেজা খালি গা, কাদা-মাখা পা আর চুলের ফাঁকে আটকে থাকা রাশি-রাশি খড়কুটো দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ওরা একটু আগেও খেতে কাজ

করছিল। আরও নিঃসন্দেহ হওয়া গেল ওদের হাতে ধরে থাকা নিড়ানি আর কোদালের মতন চাষের যন্ত্রগুলো দেখে। আপাতত ওর অবশ্য যন্ত্রগুলোকে শিকারীর মতন সতর্কতায় সামনে বাগিয়ে ধরেছে। একটি মেয়ের হাতে কে জানে কেন, গরু বাঁধার দড়ির মতন মোটা দড়িও রয়েছে কয়েক-গাছা।

শারমিন রিভলভারটাকে আবার জ্যাকেটের নীচে ঢুকিয়ে রেখে ঝোপের আড়াল ছেড়ে রাস্তায় উঠে এলো। মেয়েগুলো ওকে দেখে ভয়ঙ্কর চমকে উঠল। স্বাভাবিক। এই টিলায় এমনিতে তো কোনও মানুষের পা পড়ে না।

ওদের মধ্যে যে মহিলার বয়স সবচেয়ে বেশি, সে-ই নিশ্চয় পরিবারটির মা, বাকি তিনজন তার মেয়ে। শারমিনকে দেখে মা বলল, তুমিই গতকাল রাবিনাদের সরাইখানায় এসে উঠেছ না?

শারমিন ঘাড় হেলিয়ে বোঝাল ঠিকই বলেছ। তারপর বলল, কেমন করে জানলে ?

আরে, সরাইখানার উলটোদিকের বাড়িটাই তো আমার। আমার নাম ধীরা এরা আমার মেয়ে। ভেবেছিলাম, মাঠ থেকে ফিরে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে যাব। ইলিয়ানায় আমরা ইনস্টিটিউটের মেয়েদের খুব বেশি দেখতে পাই না তো। কিন্তু দেখো না, এমন ঝামেলায় পড়লাম। এখন কখন বাড়ি ফিরতে পারব জানি না ।

কেন? কী হয়েছে? প্রশ্নটা করেই সারমিন আবার ওদের হাতের কোদাল নিড়ানি দড়ি ওগুলোর দিকে তাকাল।

ধীরা বিরসমুখে বলল, আমাদের সঙ্গে আজ ছ'টা সীডার ছিল। খোজা করা, চাষের কাজের সীডার। এখন গম কাটার সীজন চলছে তো, তাই কো-অপারেটিভ থেকে মাত্র গতকালই ওদের ধার নিয়েছিলাম। সেগুলো পালালো।

পালালো! শারমিনের মুখটা এতটাই হা হয়ে গেল যে, সামনে দাঁড়ালে যে-কেউ তখন ওর আলজিভ দেখতে পেত । পাক্কা দশ-সেকেন্ড বাদে মুখের হা বন্ধ করে শারমিন ধীরাকে বলল, পালালো মানে? সীডাররা নিজেদের ইচ্ছেয় পালাতে পারে নাকি? ওদের নিজেদের ইচ্ছে বলেই তো কিছু নেই।

ধীরা বলল, আমিও তো জন্ম থেকে তাই জানতাম। জানতাম একজন সীডারকে যদি মাঠের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ি চলে যাই, তাহলে সেই সীডার সারা দিন, সারা রাত, ওইখানে দাঁড়িয়েই রোদে পুড়বে, জলে ভিজবে। কিন্তু ওখান থেকে এক পাও নড়বে না। কিন্তু আজকে ছ'টা সীডার হঠাৎই যব কাটতে কাটতে উঠে দাঁড়াল। দেখে মনে হল কীসের যেন গন্ধ পেয়েছে । তারপর? শারমিনের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সে কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ধীরা বলল, আমাদের খেতটা এই টিলার ঠিক পায়ের কাছে। তুমি যেদিকটা দিয়ে উঠেছ, সেদিকটায় নয়, তাই তুমি আসার পথে আমাদের দেখোনি। আরও একটু পূব ঘেঁষে। তাই ওই সীডারগুলোর পক্ষে আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এই টিলায় উঠে, জঙ্গলের আড়ালে হারিয়ে যেতে কোনও অসুবিধেই হল না। আমরা বলদগুলোকে গাড়ি থেকে খুলে, খুঁটিতে বেঁধে, যতক্ষণে ওদের ফলো করতে শুরু করেছি, ততক্ষণে ওরা অনেক দূরে চলে গেছে। এখন কী করে ওদের খুঁজে পাব বুঝতে পারছি না।

ধীরার তিনটে মেয়েই এতক্ষণ একবার সারমিন আর একবার ধীরার মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে ওদের কথা শুনছিল। এবার ছোট মেয়েটা হঠাৎ বলে উঠল, যদি বৃহিদিদি থাকত, তাহলে বলতে পারত।

ওর কথা শুনে শুধু সারমিন নয়, ওর মা আর দিদিরাও একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। ও আবার বলল, ওদের একটু আগেই তো বৃহিদিদি ওই রাস্তা ধরে এদিকে এল। আমার তো মনে হল সীডারগুলো বৃহিদিদির পিছু নিয়েই জঙ্গলে ঢুকল।

তুই বাজে বকিস না। ধীরা এক ধমকে ওর মেয়েকে থামিয়ে দিল। তারপর বলল, চল চল! শয়তান জানোয়ারগুলোকে না নিয়ে তো বাড়ি ফিরতে পারব না। কো-অপারেটিভের কাছে একগাদা জবাবদিহি করতে হবে। চল, খোঁজা শুরু করি।

তারপর শারমিনকে বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছ, দিদি?

শারমিন একটু থতমত খেয়ে বলল, ইয়ে... আমিও ওই মানে একটু গাছপালা পশুপাখি দেখার জন্যে বেরিয়েছিলাম।

ধীরা বলল, তাহলে আমাদের সঙ্গেই চলো। হিংস্র জন্তু নেই ঠিকই, কিন্তু শুনেছি এই টিলায় বিষাক্ত সাপ আছে অনেক। চারদিকে ইট-পাথরের স্তূপ তো, ওর মধ্যেই বাসা বানিয়ে থাকে হতচ্ছাড়া সাপগুলো। তোমাকে একলা

ছাড়তে ভয় লাগছে। বেশ, চলো। এই বলে শারমিন ওদের পিছু ধরল। ধীরার ছোট-মেয়েটার কথায় ওর মনে আশা জেগেছিল, ওদের সঙ্গে গেলে বৃহির দেখা পাবে আর বৃহির দেখা পেলে বার্সো শিনজার মহাকাশযানের হদিশ পাওয়াও অসম্ভব হবে না। তা ছাড়া, পালিয়ে যাওয়া সীডারগুলোকে দেখবার জন্যেও ওর মনে অসম্ভব কৌতূহল জেগেছিল। এরকম ঘটনার কথা তো কেউ কোনওদিন শোনেনি যে সীডাররা পালিয়ে যায়।

আরও প্রায় আধঘণ্টা হাঁটবার পরে হঠাৎ ধীরা দাঁড়িয়ে পড়ল। টিলাটার গা বেয়ে পুব থেকে পশ্চিমে হাঁটছিল ওরা। যে-জায়গাটায় দাঁড়াল, সেই-জায়গাটায় কি জানি কেন ঝোপঝাড় গাছপালা কিছুই নেই। ফলে নীচের দিকে তাকালে খেত-টেত পেরিয়ে একেবারে ইলিয়ানা গ্রাম অবধি সমস্তটাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। ওদিকে তাকিয়েই ধীরা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, যাক বাবা, খাটুনি বাঁচল। ওই দেখো, বদমাশগুলো নিজেরাই আবার আমাদের খেতের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

ওর কথা শুনে সারমিন এবং বাকিরাও নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল, সত্যিই তাই। ছ'টা সীডার, খোজা পুরুষদের মতোই বলিষ্ঠ তাদের দেহ, সারিবদ্ধভাবে নীচের দিকে নেমে চলেছে। ওরা প্রায় টিলার পায়ের কাছে ধীরাদের ফসলখেতের কাছে পৌঁছিয়েই গেছে।

ধীরা বলল, আমরাও যাই, দিদি। বাকি কাজটা শেষ করি। তুমিও আর থেকো না এখানে। সন্ধে হয়ে আসছে। আমাদের সঙ্গেই নেমে চলো।

শারমিন ভেবে দেখল, সেটাই ভাল। ও তো আরও কিছুদিন এখানে থাকবে। কালকেই না হয় আবার আসা যাবে বৃহির খোঁজে।

না। পরদিন অবধি অপেক্ষা করতে হল না। এই কথোপকথনের ঠিক পাঁচমিনিট বাদেই ওরা বৃহির দেখা পেল। নামার যে রাস্তা, তার ধারেই একটা গর্তের মধ্যে বৃহির শরীরটা উপুড় হয়ে পড়েছিল। ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। মাথাটা থেঁতলানো। যে-পাথরটা দিয়ে ওর রুক্ষ চুলে-ভরা মাথাটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটাও পাশেই পড়েছিল। ওই রক্তমাখা পাথরটা না থাকলে হয়তো ওরা ভাবত, কোনও হিংস্র জন্তুর কাজ। কিন্তু ওটা থাকায় আর সে-কথা ভাবার উপায় ছিল না।

তা ছাড়া লাশটাকে ঘিরে নরম মাটির ওপরে অজস্র পায়ের ছাপ ছিল; খালি পায়ের ছাপ। মানুষের পায়ের ছাপ... পুরুষ মানুষের।

ছ'টা সীডার একটু আগে বৃহিকে খুন করে গেল।

৫

বেশ কয়েকদিন হল ক্রুজার-অ্যাগনেস পৃথিবীর বুকে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে তার নিজের শহরে। সেই সঙ্গেই ফিরে এসেছে বার্সো শিনজা,; অক্ষত এবং অপরিবর্তিত। ক্রুজারের ইনটেলিজেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম তার হিমায়িত শরীরটাকে বরফের আবরণ মুক্ত করে যখন জীবনের স্পন্দন ফিরিয়ে দিয়েছে, তখন সে আবার সেই তিরিশ বছরের যুবক হিসেবেই ফিরে এসেছে পৃথিবীতে।

এই শহর একদিন বার্সো শিনজার শহর ছিল। এখন তাকে আর শহর বলে চিনতে পারছে না বার্সো। সে বুঝতে পারছে, তারা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে-পরেই বিপুল বরফের ভার গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এই শহরের যাবতীয় ঘরবাড়ি। তারপরে হিমবাহের বয়ে আনা কাদা আর নুড়িপাথর সেই দুরমুশ করা শহরের

ওপরে প্রলেপ ফেলেছে। এবং শেষতক গত পাঁচশো বছর ধরে সেই কাদামাটির আস্তরণের ওপরে গজিয়ে উঠেছে ঘন অরণ্য। কাজেই একদিন যা ছিল অত্যাধুনিক প্যাঙ্গং শহর, এখন তা একটা জঙ্গলে ঢাকা টিলার বেশি কিছু নয়।

প্রথম দুদিন বার্সো শিনজা তার ক্রুজারটার কাছ ছেড়ে নড়েনি । সামান্যতম শব্দে সে সচকিত হয়ে ঢুকে পড়ছিল ওটার ভিতরে। যেন সে একটা ইঁদুর, পেঁচার দেখা পেলেই যে দৌড়ে গিয়ে গর্তে লুকোয়। ক্রুজারটা সেই গর্ত।

তারপর সে বুঝতে পারল বেশিদিন এখানে এইভাবে বসে থাকলে সে পাগল হয়ে যাবে। ঠিক যেভাবে একটা মৃতদেহের কাছে তার নিকটতম পরিজনেরাও বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না, সেইভাবে একটা মৃত-শহরেও কেউ বেশিদিন বসবাস করতে পারে না। বিশেষত সেই শহর যদি তার জন্মভূমি হয়। যদি সেই শহরের সঙ্গে তার এক লক্ষ সুখের স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

কাজেই বার্সো আস্তে-আস্তে বেরোতে শুরু করল। রাতের ঘন অন্ধকারে সে প্রেতের মতন ঘুরতে লাগল। তার ঘোরার গণ্ডি ক্রমশ বাড়তে লাগল ।

প্রথমে সে ওই বিধ্বস্ত শহরের আনাচে-কানাচে, তার মাটি চাপা পড়া কংক্রিট-প্রকোষ্ঠগুলিতে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখল, কাউকে দেখা যায় নাকি। হ্যাঁ, সে দেখতে পেল একটি মেয়েকে। তাকে দেখে বার্সো প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, কারণ, পাঁচশো বছর সময়টা তো ভীষণ লম্বা। তাকে দেখে কি এখনকার পৃথিবীর মানুষ পাগল ভাববে? কিংবা অসুস্থ? তাকে কি ঢিল ছুড়ে মেরে ফেলবে?

তবে দূর থেকে কিছুদিন ওকে লক্ষ করেই বার্সো বুঝতে পেরেছিল, সে নয়, মেয়েটিই কিঞ্চিত উন্মাদ। উন্মাদ বলেই গ্রাম থেকে পালিয়ে এসে এই টিলায় কোনও একটা কুঠুরির মধ্যে শুয়ে থাকে। গান গায়। কাঠবেড়ালিদের রুটি খাওয়ায়।

কান পেতে দূর থেকে ওর গান শুনে বার্সো আরও নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, পাঁচশো বছরেও এই অঞ্চলের ভাষা বিশেষ বদলায়নি । সে দিব্যি ওর গানের প্রতিটি লাইন বুঝতে পারছিল। আর তা ছাড়া যদি ওই মেয়েটিকেই স্যাম্পল ধরা যায়, তাহলে এটাও বলতে হয় যে, পৃথিবীর অবস্থার উন্নতি তো হয়ইনি, বরং প্রচুর অবনতি হয়েছে। কারণ বার্সো দূর থেকেই খেয়াল করেছিল, মেয়েটির পোশাকের উপাদান সস্তা এবং আদিম। বার্সো যেদিন পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছিল, সেই বাইশশো আটানব্বই সালেও তাদের পোশাকে এর চেয়ে অনেক বেশি কৃত্রিম তন্তু ব্যবহৃত হত ।

মেয়েটির সঙ্গে একটিও বৈদ্যুতিন যন্ত্র ছিল না; না ফোন, না ল্যাপটপ। এমনকি ইয়ারফোনও নয়।

সব মিলিয়ে বার্সোর মনে হচ্ছিল, ছোটবেলায় ইতিহাস বইয়ে যে প্রাক্-আন্তর্জাল যুগের পৃথিবীর কথা পড়েছিল, সেইরকম এক পৃথিবীতে ফিরে এসেছে সে।

বার্সোর ক্রুজারটা ভাগ্যিস টিলার এক দুরূহ ফাটলের মধ্যে ভেঙে পড়েছিল, তাই মেয়েটি ওটাকে প্রথম কয়েকদিন খুঁজে পায়নি। তার মধ্যে বার্সো ওকে ভাল করে মেপে নিতে পেরেছিল। যদি সেই সময়টুকু না পেত, যদি পৃথিবীতে ফিরে আসার পর সে হঠাৎ করেই ছিটগ্রস্ত মেয়েটির মুখোমুখি পড়ে যেত, তাহলে সে কী করত? হয়তো অহেতুক আতঙ্কে আঘাত করে বসত ওকে। যাগগে, সেরকম কিছু যে হয়নি, তার জন্যে বার্সো শিনজা তার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয়।

মেয়েটিকে নিয়মিত দেখতে পেত না বার্সো। একটুখানি জায়গা তো নয় । প্রায় পঁচিশ বর্গকিলোমিটার আয়তনের টিলা অথবা শহরের ধ্বংসস্তূপ; তার মধ্যে কবে কোথায় যে মেয়েটি থাকছে তা কেমন করে জানবে বাসো ? জানতে সে আগ্রহীও নয়।

তার বরং আগ্রহ ছিল এই টিলার পায়ের কাছে, কিছুটা দূরে যে-গ্রামটা দেখা যায়, সেই গ্রামটা সম্বন্ধে। বার্সো বুঝতে পারছিল, ওই গ্রামটাকে দেখলেই সে এখনকার মানবসমাজ সম্বন্ধে একটা ধারণা পেয়ে যাবে এবং সেই ধারণা থেকেই সে ঠিক করে নিতে পারবে তার পরবর্তী কর্মপদ্ধতি।

বার্সোর দিব্যি মনে পড়ে যে, গ্রাম একটা আগেও ছিল। তাদের প্যাঙ্গং শহরের উপকণ্ঠে ঠিক ওইখানেই ছিল একটা গ্রাম। কিন্তু সেটা ছিল নামেই গ্রাম। শহরের সমস্ত সুখ-সুবিধা, সমস্ত আধুনিকতা ওই গ্রামেও পাওয়া যেত । জায়গাটাকে ‘গ্রাম’ বলা হত তার কারণ ওখানকার মানুষ ছিল কৃষিজীবী এবং পশুপালক। তাছাড়া ওখানে ছিল ব্যক্তিমালিকানার ছোট ছোট বাসগৃহ; তাদের শহরের মতন স্কাইস্ক্র্যাপারের ঢ্যাঙা বস্তি নয়।

কিন্তু টিলার ঝোপের আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে বার্সো শিনজা যখন তীক্ষ্ণ চোখে আজকের গ্রামটিকে দেখে, সে বুঝতে পারে গ্রামটি আর আগের মতন নেই। ওই আধপাগলা মেয়েটির মতন গ্রামটিও মাঝের এই পাঁচশো বছরে আদিম থেকে আদিমতর হয়ে উঠেছে। তার আকাশে আর আগের মতন ফসল বয়ে নিয়ে যাওয়ার ভেলাগুলো ভেসে আসে না। তার বাতাসে ত্রিমাত্রিক ছবির পাখিরা এসে দিনের বিশেষ-বিশেষ খবরগুলো গান গেয়ে শোনায় না । এসব তো অনেক দূরের কথা, বার্সো দেখতে পায় আজ গ্রামটিতে এমনকি বিদ্যুৎও নেই। সে ভাবে, আচ্ছা, কিছু সোলার প্যানেল বানিয়ে নেওয়াও কি ওদের পক্ষে এত কঠিন ?

বহু পরিশ্রমে পাহাড়ের চূড়া থেকে যে গন্ধক বয়ে আনার টানেলটা তৈরি করা হয়েছিল, সেটার ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। তার পাশ দিয়েই সকাল-সন্ধে নারী-শ্রমিকরা মাথায় পাথুরে গন্ধকের ঝুড়ি নিয়ে যাতায়াত করে ।

কোনও জটিল কাজেই পুরুষদের চোখে পড়ে না। পুরুষরা কাজ করে শুধু চাষের খেতে, বলদের বিকল্প হিসেবে। তাও নারীদের সাবধানী নজরের আওতায়।

কিছুদিন দূর থেকে গ্রামটাকে দেখল বার্সো শিনজা। তারপর সে স্থির করল রাতের অন্ধকারে একবার কাছে গিয়ে দেখবে। সেক্ষেত্রে তার প্রথম প্রতিবন্ধক হবে এই পোশাকটা। স্পেস স্যুটটা সে খুলেই রেখেছে। কিন্তু তার নীচে যে চাপা ট্রাউজার্স আর জ্যাকেটটা রয়েছে, সেগুলোর রঙ উজ্জ্বল রুপোলি। রাতের অন্ধকারেও চকমক করে। একসময় ওই চকমকানিটা দরকার ছিল, আজ সেটাই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জঙ্গলের মধ্যে বার্সো কালোজামের মতন একরকমের ফল খুঁজে পেয়েছিল। ফলটা সুস্বাদু। এতদিন সে মূলত ওই ফল খেয়েই বেঁচে ছিল। ফলটার রস জামের রসের চেয়েও ঘোরবর্ণ। অনেক ভাবনাচিন্তার পর বার্সো তার পোশাকের ওপরে সর্বত্র ভাল করে সেই ফলের রস লেপে নিল। তারপর আন্দাজ রাত আড়াইটের সময় পা টিপে টিপে প্রবেশ করল ইলিয়ানা গ্রামে।

একটা জিনিস দেখে একইসঙ্গে স্বস্তি এবং দুঃখ পেল বার্সো; পথের কুকুরগুলো নেই। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে কোনও বাইরের লোকের পক্ষে রাতবিরেতে গ্রামে ঢোকা এত সহজ ছিল না। পথের কুকুরেরাই তাকে ছিঁড়ে খেত। কিন্তু দিনের বেলায় সেই কুকুরগুলোই দু-মিনিটে বাইরের লোককে আপনও করে নিত। পায়ে-পায়ে ঘুরত, গায়ে মাথা ঘষত।

আরও অনেক কিছুর মতন কালো-বরফ এই পৃথিবীর কুকুরদেরও খেয়ে নিয়েছে। বার্সোর পক্ষে কারণটা বোঝা কঠিন নয়। সেই কালো দিনগুলোতে মানুষ হয়তো অসুস্থ প্রিয়জনকে ফেলে চলে গেছে, নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু কুকুর— বেচারা কুকুর তার প্রভুকে ফেলে পালাতে পারেনি; তার পাশেই থাবার ওপরে মুখ রেখে শুয়েছিল, যতক্ষণ না কালো বরফের ঢল এসে তাকে পিষে দিয়েছে।

নির্জন রাতের রাস্তা ধরে চোরের মতন গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছিল বার্সো শিনজা। দেখার সেরকম কিছু ছিল না। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, শ্লেট-পাথরের চাল। প্রতিটি বাড়ির বাইরে কিছুটা বাগান, যেখানে শাক সব্জি আর ফলমূলের চাষ হয়েছে। ঘরে-ঘরে ক্লান্তির ভারে ভেঙে পড়া নারী ও বালিকারা ঘুমে অচেতন।

হ্যাঁ, এই কদিনে টিলার ওপর থেকে সে যতটা দেখেছে তাতে সে নিশ্চিত যে গ্রামের সংসারগুলো বিশুদ্ধ নারীদের সংসার । আর এইখানটাতেই বার্সোর মূল কৌতূহল। পুরুষগুলি তাহলে থাকে কোথায় ?

পুরুষগুলি কোথায় থাকে? কীভাবে থাকে? এই প্রশ্নটার উত্তর না পেলে সে বুঝতে পারছে না আত্মপ্রকাশ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা। সে যদি কাল সকালে এই গ্রামের সরাইখানায় ঢুকে বলে, দেখো, এই আমি বার্সো শিনজা। পাঁচশো বছর বাদে ফিরে এসেছি। আমি এমন এক পুরুষ, কালো-বরফ যার শরীরে ছোবল বসাতে পারেনি, তাহলে সে কীরকম অভ্যর্থনা পাবে?

গ্রামের মেয়েরা কি তাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবে, নাকি তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে? পুরুষদের প্রতি ওদের দৃষ্টিভঙ্গি কীরকম?

এই সবটাই সে জানতে পারবে যদি সে গ্রামের পুরুষদের দেখা পায়। ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। ওরা কি তার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হবে?

এইসব ভাবতে-ভাবতেই বার্সো গ্রামের এই-রাস্তা ওই-রাস্তা ধরে সেই সীমানাটায় পৌঁছে গেল, টিলার মাথা থেকে যে-সীমানাটাকে দেখা যায় না; ঘরবাড়ির আড়াল পড়ে যায়। এখানেই সে দেখতে পেল সেই চালাবাড়িটা। রাতের অন্ধকারের মধ্যে আরও গাঢ় অন্ধকারের এক বিশাল চতুষ্কোণ স্ট্রাকচার। বার্সোর যুক্তি বলল, এখানেই গ্রামের সবকটি পুরুষ একসঙ্গে থাকতে পারে।

বাড়িটাকে ঘিরে পাহারা বলতে কিছুই প্রায় নেই। ইটের পাঁচিল নেই, রয়েছে শালখুঁটির বেড়া। তাও জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। বার্সোর মনে পড়ল, স্পেস-ক্রুজারে চেপে পৃথিবী ত্যাগ করার পরে তার সঙ্গে বান্ধবী শীলার যে কথোপকথন হয়েছিল তার কথা। মাঝে-মাঝেই কথাগুলো মনে পড়ে তার।

কী বলেছিল শীলা? বলেছিল, পুরুষমানুষরা নাকি গরু-ছাগলের মতন নির্বোধ হয়ে গেছে। কিংবা তার চেয়েও খারাপ। কথা বলতে ভুলে যাচ্ছে, জামা-প্যান্ট পরতে ভুলে যাচ্ছে। বলেছিল, মেয়েরা তাদের স্বামী সন্তানদের টানত-টানতে নিরাপদস্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। ব্যারাক-বাড়ির মতন চৌকোনা বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে বার্সোর আবার সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল। তাই যদি হয়, তাহলে তো সত্যিই পাহারার কোনও দরকার নেই।

কিন্তু একইসঙ্গে অন্য একটা প্রশ্ন বার্সোর মনকে বারবার বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিল। যদি পৃথিবীর পুরুষেরা আজও সেরকমই নির্বোধ, সেরকমই ভাষাহীন জড়বস্তুই রয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও নারীরা কেন তাদের কাছে-কাছে রাখছে না? কেন তাদের সঙ্গে এমন জন্তু-জানোয়ারের মতন ব্যবহার করছে?

এই কয়েকদিনে দূর থেকে বার্সো যতটা দেখেছে, সে কোনও নারীর আচরণে পুরুষদের প্রতি বিন্দুমাত্র কোমলতা কিংবা আকর্ষণ দেখতে পায়নি। ঠিক কত প্রজন্মের ব্যবধানে এই পৃথিবীর নারীদের মন থেকে দয়িতের প্রেমের স্মৃতি, পিতার আদরের স্মৃতি, পুত্রের আবদারের স্মৃতি মুছে গিয়েছিল ? জানতে ইচ্ছে করে তার। কিছুই কি আর অবশিষ্ট নেই?

শালখুঁটির বেড়ার ফাঁক গলে জমিটার মধ্যে ঢুকে, বার্সো একটা খোলা জানলা দিয়ে ভিতরে উঁকি মারল। সারা ঘরে আলো বলতে চারটে লণ্ঠন, যেগুলো সিলিং-এর হুকের সঙ্গে টাঙানো রয়েছে। সেই আলোয় বার্সো দেখল মেঝেয় খড়ের বিছানা। তার ওপরে শুয়ে পুরুষেরা ঘুমোচ্ছে। ঘরের এককোণে দুজন বৃদ্ধা টেবলের দুদিকে দুটো চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছেন। এর বেশি কোনও পাহারা নেই। ঘরের দরজার বাইরে একটা খড়ের চালার নীচে স্তূপ করে রাখা আছে কোদাল, ঝুড়ি, বেলচা লাঙল ইত্যাদি চাষের সরঞ্জাম। অর্থাৎ, এরাই সেই পুরুষ যাদের সে চাষের খেতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে দেখেছে।

বার্সো আবার ধীরে-ধীরে বেড়া পেরিয়ে গ্রামের রাস্তায় উঠে এলো। রাত যত বাড়ছিল, ততই হাওয়ায় হিমেল ভাব বাড়ছিল। জ্যাকেটের পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে মাথা নীচু করে হেঁটে চলেছিল বার্সো। নিজের চিন্তায় বিভোর। চিন্তা বলতে ওই একটাই; সে কি গ্রামের মেয়েদের সামনে আত্মসমর্পণ করবে? করলে কি তার জায়গা হবে ওই ব্যারাকবাড়িতে? তাকেও কি বলদের পাশে জোয়ালে কাঁধ দিয়ে লাঙল টানতে হবে?

নাকি, তার বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ইত্যাদির স্বাভাবিকতা দেখে তাকে নিজেদের সমাজেই জায়গা দেবে গ্রামের মেয়েরা ?

ভেবে কোনও কুল পাচ্ছিল না বার্সো শিনজা।

হঠাৎই তার চোখে পড়ল আরেকটা ব্যারাকবাড়ি। আগেরটার মতনই চৌকোনা, অনাড়ম্বর একটা স্ট্রাকচার। কিন্তু তবু এটা যেন আগেরটার চেয়ে কিছু বিষয়ে আলাদা। তেমন কিছুই না, শুধু এটার চারিপাশে বাগানটা আরেকটু যত্ন নিয়ে গড়া। বাড়িটার গায়ে নতুন রঙের প্রলেপ, অন্ধকারের মধ্যেও যা উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছিল। আর এর চারিপাশে ইটের পাঁচিলটাও বেশ উঁচু।

বার্সোর কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠল। সে চট করে চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে পাঁচিল বেয়ে উঠে বাগানের ভিতরে লাফিয়ে পড়ল। পায়ে রাবার সোলের জুতো ছিল, কাজেই শব্দ হল না। তারপর আগের মতোই একটা খোলা জানলার ভিতর দিয়ে বাড়ির ভিতরটায় নজর রাখল।

হ্যাঁ ভিতরটাও আলাদা, বেশ আলাদা। এখানে রয়েছে আলাদা-আলাদা কামরা, যাদের দরজাগুলো বন্ধ। সব মিলিয়ে এরকম অন্তত কুড়িটা কামরা। ঘরটাকে দেখে বার্সোর হাসপাতালের কথা মনে পড়ে গেল। এমন এক ওয়ার্ড, যেখানে সার দিয়ে পেশেন্টদের জন্য সিঙ্গল কেবিনের ব্যবস্থা রয়েছে।

হাসপাতালের ছবিটা আরও বেশি করে ওর মনে আসছিল তার কারণ, ঠিক হাসপাতালের ওয়ার্ডের মতোই এখানেও কেবিনগুলোর বাইরে দুজন যুবতী টেবিল চেয়ার সাজিয়ে বসেছিল। যেন রাতের অ্যাটেন্ড্যান্টদের বুথ। এদেরও মাথার ওপরে কাবার্ডে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখা ফাইলের স্তূপ। মেয়েদুটির পোশাকও অনেকটা নার্সদের মতোই। সেই সাদা স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ। মাথায় সাদা ক্যাপ ।

ওদের বুথের ঠিক পেছনেই দুটো পরিচ্ছন্ন দরজা দেখতে পাচ্ছিল বার্সো। দুটোরই পাল্লা বন্ধ। একটার ওপরে লেখা চেঞ্জ রুম। অন্যটার ওপরে ওয়াশ-রুম।

বার্সো চেয়ে থাকতে-থাকতেই ওয়াশ-রুমের দরজাটা খুলে গেল। ভিতর থেকে একজন বছর ত্রিশের যুবতী বেরিয়ে এলেন। আপাদমস্তক ঢাকা তামারোর বদলে তার পরনে এখন খুব পাতলা কাপড়ের হ্রস্ব এক স্কার্ট, যেটা কোনওমতে উরুসন্ধির নীচে অবধি নেমেই শেষ হয়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে চেঞ্জ-রুম থেকে পোশাক বদল করে বেরোলেন।

মহিলা আলোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকায় বার্সো পরিষ্কার বুঝতে পারল যে তার পরনে এই-মুহূর্তে কোনও অন্তর্বাস নেই। মসলিনের মতন পাতলা ফেব্রিক ভেদ করে তার শরীরের প্রতিটি ঢেউ সোচ্চারে নিজেদের জানান দিচ্ছিল।

বার্সোর অন্তর্গত শালীনতাবোধ তাকে বলছিল চোখ ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু অন্যদিকে তার অনুসন্ধিৎসা বলছিল, 'দেখে যাও কী হয়। তোমার অনেক প্রশ্নের জবাব এখনই তুমি পেয়ে যেতে পারো।'

অনুসন্ধিৎসারই জয় হল। বার্সো নিজেকে জানলার পাল্লার আড়ালে আরও কিছুটা লুকিয়ে ফেলে, শুধু চোখদুটো বার করে রাখল। দেখতে লাগল এরপরে কী হয়।

হল না তেমন কিছুই। নার্সের মতন পোশাক পরে যে দুজন মহিলা বসেছিলেন তারা তড়িঘড়ি একটা ফাইল বার করে কিছু লেখালেখি করলেন। তারপর তাদের মধ্যে একজন ওই মহিলাকে ইশারা করলেন তার সঙ্গে যেতে। ওরা দুজন যে বন্ধ কেবিনটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, সেটাও বার্সোর দৃষ্টিসীমার মধ্যেই ছিল। নার্স-মহিলার হাতে একটা জোরালো আলো ছিল। দরজার বন্ধ পাল্লাটা সেই আলোয় আলোকিত হতেই বার্সো দেখতে পেল দরজার গায়ে একটা বোর্ডে লেখা আছে 'সীডার নাম্বার ফোর, এজ টোয়েন্টিথ্রি, লাস্ট মেটিং ডেট...'। ডেট শব্দটার পরে পেন্সিলের রেখায় একটা তারিখ লেখা ছিল। তার নীচে ওই নার্সের মতন মেয়েটি আরেকটি তারিখ বসালো । বার্সোর বুঝতে অসুবিধে হল না সেটি এই পৃথিবীর নতুন ক্যালেন্ডারে সেদিনের তারিখ।

তারপর মেয়েটি দরজার পাল্লাটা একহাতে ঠেলে খুলে, অন্য হাতে হ্রস্ববাসা মহিলাকে ইশারা করল তার পেছন-পেছন ঘরের ভিতরে ঢুকতে।

নার্স মেয়েটি হাতের বাতিটা ঘরের দেয়ালে একটা হুকে টাঙিয়ে দিতেই ঘরের ভিতরটা আলোকিত হয়ে উঠল। বার্সো দেখল, ঘরের মধ্যে বেশ বড় এবং পরিচ্ছন্ন একটা বিছানা। সেই বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়েছিল একটি যুবক। মেয়েদুটি ঘরে ঢুকতেই সে আস্তে আস্তে মাথাটা ওদের দিকে ফেরাল ।

নার্স মেয়েটি সেই আগন্তুক মহিলাকে ইশারা করল বিছানার দিকে এগিয়ে যেতে। তারপর বাইরে বেরিয়ে দরজাটা আলতো করে ভেজিয়ে দিল।

ওর ঘর থেকে বেরোতে যেটুকু সময় লাগল, তার মধ্যেই যুবকটি বিছানা থেকে ঘরের মেঝেতে নেমে আগন্তুক মহিলার দিকে এগিয়ে গেল। বার্সো দেখল ছেলেটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ এবং তার পুরুষাঙ্গ এই সামান্য সময়ের মধ্যেই দৃঢ় এবং উত্থিত হয়ে উঠেছে।

এর পরে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বার্সো আর কিছু দেখতে পায়নি । তবে তার আর কিছু দেখার ছিলও না। সে বুঝতে পেরেছিল, পৃথিবীতে যে-কটি পুরুষ এখনও বেঁচেবর্তে রয়েছে, তাদের দুরকমের স্ট্যাটাস। মাত্রই দু-রকমের, তার বাইরে কিছু নয়। হয় খোজা হয়ে খেতের শ্রমিক আর না হলে জনন-সক্ষম হয়ে সীড়ার।

কীভাবে ওরা ঠিক করে কোন পুরুষ চাষের কাজে লাগবে আর কোন পুরুষ সন্তান উৎপাদন করবে? কিছুটা আন্দাজ করতে পারে বার্সো। চাষের খেতে যারা কাজ করে তাদের গড়পড়তা ত্বকের রং, চুলের রং, শরীরের গঠন সব একরকমের। ভ্যারাইটি নেই। অন্যদিকে এইমাত্র সে সীডারদের ব্যারাকে যাদের দেখে এলো, তারা কেউ শ্বেতাঙ্গ, কেউ কৃষ্ণাঙ্গ, কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা।

ঠিকই করছে মেয়েগুলো। প্রজনন বিদ্যার এটাই তো গোড়ার কথা; ভ্যারাইটি। একই জিন-ব্যাঙ্ক থেকে ক্রমাগত জিন মিশিয়ে গেলে কয়েক প্রজন্ম বাদে সন্তানগুলি জেনেটিকালি দুর্বল হয়ে পড়বে। সেটা কোনওভাবে এই মেয়েগুলো আন্দাজ করেছে। হয়তো ওদের মুরগি কিংবা গোপালনের অভিজ্ঞতা থেকেই সারকথাটা বুঝে নিয়েছে ওরা।

এবং সেইখানেই বার্সোর ভয়। সে জানে, তার নিজের চেহারা ঠিক এখানকার খোজা-হওয়া পুরুষগুলির মতন। সেরকমই ফর্সা গায়ের রং, চওড়া কাঁধ কিন্তু চোখের পাতা, ভুরু আর চুল কুচকুচে কালো। চোখের মণিও তাই। সেটাই স্বাভাবিক, যেহেতু সে এই অঞ্চলেরই লোক । কাজেই সে যদি কখনও এদের হাতে ধরা পড়ে, কিংবা নিজে থেকে ধরা দেয়, তাহলে কপালে কী নাচছে সে-ব্যাপারে বার্সোর নিজের মনে একটুও সংশয় ছিল না। পুরুষদের সম্বন্ধে এখনকার পৃথিবীর মেয়েদের মনোভাব যে কি, সেটা এই কদিনে সে বিলক্ষণ বুঝে নিয়েছে।

কোনও চাষি যদি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে যে, তার উঠোনে একটা চমৎকার বেওয়ারিশ এঁড়ে-বাছুর দাঁড়িয়ে আছে, সে বাছুরটাকে নিয়ে কী করে? যা করে, এই গ্রামের মেয়েরাও তাকে নিয়ে ঠিক তাই করবে। অতএব আপাতত টিলার গভীরে লুকোনোর জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসার চিন্তাটাকে মাথা থেকে তাড়িয়েই দিল বার্সো।

আরও কয়েকটা দিন যাক। ব্যাপারগুলো আরও একটু বুঝে নেওয়া যাক । তারপর ইতিকর্তব্য স্থির করা যাবে।

বার্সো শিনজা তার গ্রাম-অভিযান সেরে যখন টিলায় ফিরে এলো, তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। কিন্তু তখনই ক্রুজারের মধ্যে ঢুকল না । আসলে ওর খিদে পেয়েছিল। এই কদিনে মোটামুটি এই টিলায় কী কী খাদ্যবস্তু পাওয়া যেতে পারে, তার একটা আন্দাজ ওর হয়ে গিয়েছিল। খুব বেশি কিছু যে পাওয়া যায় তা হয় তো নয়। কিন্তু যা পাওয়া যায় তা একজন মানুষের প্রাণধারণের পক্ষে যথেষ্ট।

সবথেকে বেশি পাওয়া যায় নানা ধরনের সুস্বাদু ফল। এই ব্যাপারটা বেশ মজার। প্রথমদিকে বার্সো ভেবেই পেত না, একটা জঙ্গলের মধ্যে আপেল আঙুর ন্যাসপাতির মতন বাগিচার গাছ আসে কোথা থেকে। তারপর তার খেয়াল হল, তাই তো। এটা তো আর প্রাকৃতিক জঙ্গল নয়। এককালে তো এখানেই একটা

শহর ছিল। সেই শহরে ফলফুলের বাগিচাও ছিল। কালো বরফ গলে যাওয়ার পরে সেইসব গাছের বীজই আবার এখানে ওখানে মাথা চাড়া দিয়েছে।

দিয়েছে বলেই বার্সো গত কয়েকদিন খেয়েদেয়ে সুস্থভাবে বেঁচে আছে। তাছাড়া টিলায় প্রচুর খরগোশ আর তিতির পাখির বাস। এই দুটি পাখি আর প্রাণীকে ফাঁদ পেতে শিকার করে বার্সো, যখন মাংস খেতে ইচ্ছে হয়। তবে আগুন জ্বালানোর ব্যাপারে একটু সাবধানে থাকতে হয়। নীচের গ্রাম থেকে যেন ধোঁয়া না দেখা যায় ।

সেদিনও বার্সো টিলার মাথায় যে-ঝরনা তার জলে স্নান করে, কিছু মেটে আলো আর ঝরনার মাছ পুড়িয়ে খেয়ে, যখন তার আস্তানায় ফিরল তখন বিকেল হয়ে গেছে।

হয়তো গত আড়াই-হাজার বছর ধরে তার নাক কোনও গন্ধ পায়নি বলেই বার্সোর ঘ্রাণশক্তি এখন ওভারটাইম খাটছিল। কান বা চোখের ক্ষেত্রেও একই কথা। প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ই অসম্ভব ধারালো হয়ে উঠেছিল তার। আপাতত

টিলার ফাটলের মধ্যে, আবছা অন্ধকারে, তার ঘ্রাণশক্তিই তাকে বলে দিল, ‘বাইরের লোক এসেছিল শিনজা। তোমার এই মহাকাশযানের ভিতরে ঢুকেছিল সে।

কে এসেছিল সে সম্বন্ধেও বার্সোর কোনও সন্দেহ ছিল না। সেই আধপাগলি মেয়েটা। ওর গায়ের গন্ধ চেনে বার্সো। একমাত্র ওর গায়ের গন্ধই চেনে। আর দ্বিতীয় কোনও মানুষ তো ওর কাছাকাছি থাকে না । মেয়েটা থাকে।

এর আগেও একদিন মেয়েটা ক্রুজারের ভিতরে ঢুকেছিল। বার্সো জানে সে-কথা। সেদিন মেয়েটা হাতের কাছে লগবুকটা পেয়ে সেটা তুলে নিয়ে পালিয়েছিল। আর কিছু নিয়েছিল কিনা জানে না। অবশ্য নেওয়ার মতন আছেটাই বা কী?

বার্সোর জ্যাকেটের পকেটে একটা ফ্ল্যাশ-লাইট ছিল। সেটার আলোয় একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখতে গিয়ে সে যা দেখল তাতে আতঙ্কে তার বুকটা হিম হয়ে গেল । ফাটলের মধ্যে মেয়েটা একা ঢুকেছিল ঠিকই, সেখানে ধুলোর ওপরে শুধু মেয়েটারই পায়ের ছাপ আছে। কিন্তু ফাটলের বাইরে, দুমড়ে যাওয়া ঝোপেঝাড়ে, কাদায়, ধুলোয় আরও বেশ কয়েকজনের পায়ের ছাপ। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ছাপগুলো পুরুষমানুষের খালিপায়ের ছাপ এটা কেমন করে হয়? মেয়েটা কি সঙ্গে করে ওই বেটাছেলেগুলোকে নিয়ে এসেছিল? ওর কি এত ক্ষমতা আছে? দেখলে তো মনে হয় সমাজ-পরিত্যক্ত একটি জীব।

তাহলে কি বেটাছেলেগুলো মেয়েটাকে অনুসরণ করে এখানে পৌঁছে গিয়েছিল। সেটাই বা কীভাবে সম্ভব? কাউকে গোপনে অনুসরণ করতেও তো বুদ্ধি লাগে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা লাগে। এই-মুহূর্তে পুরুষদের তো বুদ্ধি-টুদ্ধি নেই বলেই সে জানত। কাল রাত্রির গ্রাম-সফরেও তো সেটাই দেখা গেল। তাহলে কারা এসেছিল মেয়েটির পেছন-পেছন? কেন এসেছিল? বার্সোর যষ্ঠেন্দ্রিয় হঠাৎই তীব্র অ্যালার্মের মতন বিপদসংকেত পাঠাতে শুরু করল। তার মাথার মধ্যে কেউ যেন চিৎকার করে বলে উঠল, পালাও বার্সো, পালাও। ওরা তোমার ডেরা চিনে গেছে। তুমি আর একদমই নিরাপদ নও।

‘ওরা’ বলতে কারা, তা জানে না বার্সো। কিন্তু তাকে যে এক্ষুনি এই জায়গাটা ছাড়তে হবে সে-ব্যাপারে তার কোনও সন্দেহ ছিল না। এজারের দরজার লকটা ঠিক ছিল। ফিঙ্গার-প্রিন্ট দিয়ে লক করার সিস্টেম। সেটাকে লাগিয়ে দিয়ে সে দ্রুত জায়গাটা ছেড়ে টিলার গা বেয়ে অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করল। কোথায় যাবে সে জানে না। সে কি এই টিলা ছেড়ে, এমনকি ওই ইলিয়ানা গ্রামেরও পাশ কাটিয়ে জনবিরল এই পৃথিবীর কোনও এক প্রান্তরে হারিয়ে যাবে?

কথাটা ভাবতেই বার্সোকে তীব্র এক হতাশা জড়িয়ে ধরল। এইভাবে হারিয়ে যাবে বলেই কি তার পৃথিবীতে ফিরে আসা? মালিকের সঙ্গে সেদিনই মহাশূন্যে বেরিয়ে গেলে কী ক্ষতি ছিল?

গুরুদেব। সেই দূরদর্শী লোকটি বলেছিলেন না, 'ক্রুজারটাকে ফেরত নিয়ে চল। যা বুঝছি, পৃথিবীতে এখন আমাদের প্রয়োজন। আর সব বেটাছেলে তো বাউড়া হয়ে গেছে।'

সেদিন ফেরা যায়নি। কিন্তু সেই প্রয়োজন তো আজও আছে। আজও তো তামাম পুরুষ বাউড়া হয়েই ঘুরছে। সে কি এত সহজে লড়াইটা ছেড়ে দেবে?

সে যখন এইসব ভাবছে, তখনই হঠাৎ হাওয়া দিক বদলাল। এতক্ষণ যে-হাওয়া পুব থেকে পশ্চিমে বইছিল, সেই-হাওয়া পশ্চিমদিক থেকে ছুটে এল আর তার সঙ্গে বয়ে নিয়ে এল নারীকণ্ঠে আতঙ্কের চিৎকার। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। একজনের গলায় নয়, একাধিক মেয়ের গলায়।

বার্সো এই অভাবনীয় ঘটনায় হতভম্ব হয়ে গেল। সে জানত এই টিলায় গ্রামের মানুষেরা পারতপক্ষে পা দেয় না। তাহলে আজ ওরা এসেছে কেন? বার্সো যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেখান থেকেই জমিটা ঢালু হয়ে একেবারে টিলার নীচে অবধি নেমে গিয়েছিল। সে মাটির ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে, খুব সাবধানে ঘাড়টা বাড়িয়ে নীচের দিকে তাকালো। দেখল নানান বয়সের পাঁচটি মেয়ে একটা জায়গাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আর খুব উত্তেজিত গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ওদের মধ্যেই কয়েকজন একটু আগে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু কেন?

প্রথমেই যার দিকে চোখ পড়ল সেই মেয়েটির বয়স তার মতোই ত্রিশের কোঠার মাঝামাঝি হবে। তার পোশাক-আশাক এবং চালচলন সঙ্গিনীদের থেকে আলাদা বলেই তাকে আগে চোখে পড়ল। তামারো নয়, মেয়েটি পরে আছে মোটা কাপড়ের ট্রাউজার্স আর শার্ট। বার্সো দেখল, মেয়েটির পকেটে একটা কলমও গোঁজা আছে। সব মিলিয়ে প্রাক্-তুষারযুগের পৃথিবীর কোনও মেয়ের সঙ্গে বেশ মিল আছে মেয়েটির।

তাছাড়াও রয়েছেন এক বয়স্কা মহিলা আর পিঠোপিঠি বয়সের তিন বালিকা। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, মা আর তিনটি মেয়ে। ওদের মধ্যে যে মেয়েটা সবচেয়ে ছোট, সে তখনও মায়ের বাহুর মধ্যে মুখ গুঁজে থরথর করে কাঁপছে আর মাঝে-মাঝে আড়চোখে ওদের গণ্ডির মাঝখানে তাকাচ্ছে। তারপর আবার মুখ লুকোচ্ছে মায়ের হাতের মধ্যে।

বার্সো ভাবছিল, কী আছে ওখানে? ওদের মুখগুলো অমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কেন ?

বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। ওরা পাঁচজনেই হঠাৎ কী যেন দেখে পাহাড়ের ঢালের দিকে দৌড়ে গেল আর তখনই বার্সো মৃতদেহটা দেখতে পেল। সেই আধপাগলি মেয়েটা ক্ষতবিক্ষত শরীরে পড়ে রয়েছে। এতক্ষণ ওই মৃতদেহটাকে ঘিরেই ওই মেয়েরা দাঁড়িয়েছিল।

মৃতদেহটা দেখা-মাত্রই বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে বার্সোর হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে চলে এল। নিরীহ মেয়েটাকে এভাবে কারা খুন করতে পারে?

উত্তরটাও তখনই পেয়ে গেল সে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল, ওই মেয়েরা খুব উত্তেজিতভাবে আঙুল তুলে নীচের দিকে দেখাচ্ছে। ওদের ইশারা অনুসরণ করে বার্সোও দেখতে পেল ছ'জন শ্রমিক-পুরুষ টিলার ঢাল বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে।

তারপর সারাদিন এক অদ্ভুত মিশ্র-অনুভূতি নিয়ে কাটালো বার্সো। তার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না, তার জন্যেই মরতে হল ওই মেয়েটাকে, যার নামটা সে আজকেই গ্রামের মহিলাদের কথাবার্তা কান পেতে শুনে জেনেছে।

বৃহি। হ্যাঁ, মেয়েটির নাম ছিল বৃহি।

বৃহিকে যে ওরা খুন করল তার একমাত্র কারণ নিশ্চয়ই এই যে, বৃহি তার উপস্থিতির খবর গ্রামের মেয়েদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। হয়তো তার লগবুকটাও বৃহিই গ্রামের মেয়েদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

শুধু এই অপরাধে যদি ওরা বৃহির প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, তাহলে তার ওপরে কতটা ঘৃণা পোষণ করে ওরা... ওই পুরুষেরা?

সেদিন সারাদিন বার্সো দূর থেকে দেখল গ্রামবাসিনীদের উত্তেজনা দেখল ওরা অনেকে মিলে কীভাবে বাঁশের চালিতে চাপিয়ে বৃহির মৃতদেহ টিলা থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল গ্রামের শ্মশানে। দূর থেকেই সে দেখল চিতার নীল ধোঁয়া পাক খেতে খেতে মিলিয়ে গেল পাহাড়ে জঙ্গলে।

সারাদিন সে বসে রইল এমন একটা জায়গায়, যেখানে পেছনে আর দু-পাশে পাথরের দেয়াল। খোলা শুধু সামনেটা। সেদিক থেকে কেউ আক্রমণ করলে সে কী করবে জানত না বার্সো। তবে হাতের কাছে কিছু পাথরের টুকরো জড়ো করে রেখেছিল।

পাথরের টুকরো। নিজের মনেই সেগুলোর দিকে তাকিয়ে একবার হেসে উঠল বার্সো। আদিমানবের অস্ত্র। সেই অস্ত্র ব্যবহারের কথা ভাবছে এমন একজন, কদিন আগেই যে মহাকাশভ্রমণ করে ফিরেছে।

৬

নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিল শারমিন। এপার ওপার দেখা যায় না এমনই বিস্তার সেই নদীর। বিকেলের আলোয় জলের রং চাঁপাফুলের মতন হলুদ । আপাত শান্ত সেই জলরাশির তলায়-তলায় কিন্তু তীব্র চোরাস্রোতের টান রয়েছে।

সেইজন্যেই নদী পেরিয়ে আসতে এত সময় লাগছে ভেলাটার। পাঁচদিন আগে এই ভেলার সারেঙের হাত দিয়েই সে ইনস্টিটিউটে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল। সেই চিঠিতে তার আগের তিনদিনের সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা বিশদে লিখে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষার কাছে জানতে চেয়েছিল, এখন আমার কী কর্তব্য?

চিঠিতে সে লিখেছিল বৃহির কাছ থেকে পাওয়া লগবুকের কথা, সেই লগবুকে বার্সো শিনজা নামে এক পুরুষের বয়ানে কালো বরফ ঝরার দিনগুলো সম্বন্ধে যা-যা লেখা আছে সেই কথা।

লিখেছিল, বার্সো এবং তার ক্রুজারের পৃথিবীতে ফিরে আসার সম্ভাবনার কথা।

কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগ নিয়ে লিখেছিল ছটি শ্রমিক-পুরুষের স্বেচ্ছায় চাষের খেত ছেড়ে পালানো এবং বৃত্তিকে হত্যা করে আসার ঘটনা। এটা যদি বিচ্ছিন্ন এক ঘটনা না হয়, যদি ছ’জন, বারো-জন, আঠারো জন করে পৃথিবীর সমস্ত খোজা শ্রমিক এবং সীডার এইভাবে স্বেচ্ছাচারী এবং ঘাতক হয়ে ওঠে, তাহলে মানবসভ্যতার আয়ু আর বেশিদিন নেই। চিঠিতে এই কথাগুলোর নীচে সে বারবার পেন্সিল দিয়ে আন্ডারলাইন করে দিয়েছিল।

তারপর লিখেছিল, আমি খুব ভীত। ইনস্টিটিউট থেকে রক্ষীবাহিনী পাঠান। এবং পাঠান চিকিৎসকদল। তারা পুরুষগুলিকে পরীক্ষা করে দেখুন, গন্ডগোলটা কোথায়। যদি তাঁরা দেখেন যে, ওই ছটি পুরুষ কোনও সংক্রামক অসুখে আক্রান্ত, তাহলে ওদের এলিমিনেট করার ব্যবস্থা করুন। রোগটা অন্য পুরুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আগে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলুন ওদের।

ভেলার সারেঙ নদী পেরিয়ে ওপারের মালগাড়ির গার্ডের হাতে তুলে দেবে সেই চিঠি। তিনি ইনস্টিটিউটের পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার ট্রেনটাকে থামিয়ে সেই চিঠি অধ্যক্ষার হাতে তুলে দেবেন। আবার নদীবন্দরে ফিরবার সময় অধ্যক্ষার কাছ থেকে জবাবি চিঠি নিয়ে আসবেন। এইভাবেই প্ল্যানটা বানিয়েছিল শারমিন। তাতে পাঁচদিনই লাগার কথা এবং আজকেই সেই পঞ্চমদিন।

সেইজন্যেই দুপুর থেকে নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে শারমিন। ওর সঙ্গে এসেছে ধীরার ছোট মেয়েটা। এখন ফসল কাটার সময়। গ্রামের আর কোনও মেয়ের সুযোগ ছিল না তার সঙ্গে আসার। একমাত্র এই বালিকাটির কাজই অন্যেরা ভাগ করে করে নিতে পারে । তাই এই মেয়েটিকে ছাড়া গেছে।

তাতেই অনেকটা স্বস্তি পেয়েছিল সারমিন। কারণ, তার মন বলছিল, বেছে বেছে বৃহিকেই যে ওরা খুন করে এল, সেটা কাকতালীয় নয়। আসলে বৃহিকে ওরা একটা অপরাধের শাস্তি দিল।

সেই অপরাধটা কী?

অপরাধটা হল, বুহি শারমিনের সামনে একটা বহুদিনের বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছিল। সেই দরজার সামান্য ফাঁকের মধ্যে দিয়ে শারমিন দেখতে পেয়েছিল প্রাক্ তুষারযুগের পৃথিবীর এমন এক ছবি, যে-ছবি তার আগে আর কোনও নারী দেখতে পায়নি। সক্ষম পুরুষে ভরা এক পৃথিবীর ছবি দেখেছিল সে।

শারমিনের যুক্তি বলছিল, এই গ্রামের সীডাররা এর পরে তাকে খুন করবে। এইভাবে হাজার বছরের বন্ধ দরজাটা যেটুকু খুলেছিল সেটুকুকে আবার শক্ত করে বন্ধ করে দেবে ওরা।

সেইজন্যেই বাচ্চা মেয়েটা সঙ্গে আসায় অনেকটা স্বস্তি পেয়েছিল শারমিন। ও সঙ্গে ছিল বলেই অন্তত ইলিয়ানা গ্রাম থেকে নদীতীরে আসার পথটুকু ভুল হবার সম্ভাবনা ছিল না। মাইল-তিনেক লম্বা রাস্তাটার প্রথম দিকটা সত্যিই নির্জন এবং অজস্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত পথ হারাতেই পারত ।

অবশ্য নির্জন রাস্তাটুকু পার হয়ে আসার পরে আর ভয় ছিল না। বাকি রাস্তাটার দু-পাশে শুধুই গন্ধকের গোডাউন, ঠেলাগাড়ির আড্ডা, ভেলায় মাল ওঠানো-নামানোর জন্যে শয়ে শয়ে নারী-শ্রমিকের ব্যস্ত দৌড়াদৌড়ি । এই জায়গাটা বৃহির বধ্যভূমির মতন নির্জন নয়। এখানে কোনও খোজা-শ্রমিক ইচ্ছে থাকলেও তার গায়ে হাত দিতে পারবে না।

‘ইচ্ছে থাকলেও’। পাঁচদিন আগেও কথাটা কিছুতেই তার মাথায় আসত না। সীডারদের আবার ইচ্ছে-অনিচ্ছে কী? প্রকৃতির নিয়মে ওরা খাবার খায়, ঘুমোয়। খোজা না হলে সীড-ফার্মের কেবিনে উর্বরা মেয়েদের মৈথুন করে। ব্যাস। এই তো ছিল চিরকালের নিয়ম। কিন্তু কদিন আগে ওই ছ'টি সীড়ার শারমিনের এতদিনের সেই ধারণাকে মিথ্যে করে দিয়েছে। এখন সে বিশ্বাস করে, ওদের কখনো কখনো আহার-নিদ্রা-মৈথুনের বাইরেও কোনও ইচ্ছা জাগতে পারে। খুনের ইচ্ছে।

নিজের চিন্তার স্রোতে নিজেই ডুবে গিয়েছিল শারমিন। একবার চোখ তুলে সামনের দিকে তাকালো। অনেকক্ষণ ধরে যেটাকে একটা কালো বিন্দুর মতন দেখতে লাগছিল, সেটা এখন স্পষ্ট এক চৌকোনা ভেলার অবয়ব নিয়েছে। মাঝনদী পেরিয়ে এসেছে ভেলাটা।

একবার পেছনদিকে তাকিয়ে ধীরার মেয়েটিকেও দেখে নিল সারমিন। ওর নাম কুশি। বেচারি বাঁধানো জেটির একপ্রান্তে মুখের ওপরে লাল টুকটুকে ক্যাপটা ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। ক্যাপটা আজকেই সারমিন ওকে উপহার দিয়েছে এবং তাতে ভীষণ খুশি হয়েছে মেয়েটা। জলের ধারে এসে দাঁড়াবার আগে শারমিন নিজের চামড়ার কাঁধব্যাগের স্ট্যাপটা ওর গলা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে বলেছিল, এটাকে সাবধানে রাখ। জলে পড়ে না যায়, দেখিস। ভিতরে দরকারি কাগজপত্র আছে। কুশি লক্ষ্মী মেয়ের মতন ঘাড় হেলিয়েছিল। এবং সেটা যে অযথা হেলায়নি তা বোঝা যাচ্ছে। এইযে ও মুখের ওপরে টুপি চাপা দিয়ে শুয়ে রয়েছে, সারমিনের সেই ব্যাগ কিন্তু এখনও ওর গলাতেই ঝুলছে।

ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটা ঘুমিয়েই পড়েছে। দোষ নেই ওর। ভোর থেকে রাত, যে অক্লান্ত পরিশ্রমটা করতে হয় ওদের ; এরকম একটা ছুটির বিকেল পেলে ঘুমিয়ে তো পড়বেই।

সারমিন আবার নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল ।

এটা ঠিক যে ওই ছটি সীডার সেদিনের পর থেকে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। অর্থাৎ ওদের চোখের দৃষ্টির মধ্যে হাজার চেষ্টা করেও বুদ্ধির কোনও দীপ্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চব্বিশঘন্টা ওয়াচে রেখেও ওদের এমন একটা কিছু করতে দেখা যায়নি, যে-কাজটা করতে গেলে ছিটেফোঁটাও বুদ্ধি লাগে।

চারটে দিন কেটে যাওয়ার পরে গতকাল ধীরা গিয়ে কো-অপারেটিভে কেঁদে পড়েছিল। বলেছিল আমার ছ'টা লেবারকে খোঁয়ার থেকে না ছাড়লে তো আমার ফসলগুলো মাঠে পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাবে। আজ একটা গরু যদি কাউকে গুঁতিয়ে মেরে ফেলে তাহলে তোমরা কি তাকে এইভাবে অনন্তকাল আটকে রাখো?

তখন কো-অপারেটিভের মেয়েরা সারমিনকেই জিজ্ঞেস করেছিল, কী করব দিদি?

শারমিনের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল। সে বলেছিল, ওদের একদিনের জন্যে মাঠের কাজে ছেড়ে দাও। কিন্তু সেইসঙ্গে হাতের কাছে অন্তত দুজন অস্ত্রধারী মেয়েকে রেখো, যাতে বেগড়বাই দেখলেই ওদের

পায়ে গুলি করতে পারে।

মেয়েরা তাই করেছিল এবং ওই ছ'জন লেবার দিব্যি সারাদিন শান্তভাবে মাঠে কাজ করে ফিরে এসেছিল। বলপ্রয়োগের দরকার পড়েনি।

তবু সারমিন কো-অপারেটিভের মেয়েদের ওই ব্যবস্থাই বহাল রাখতে বলেছে। অন্তত ততদিন, যতদিন না ইনস্টিটিউটের রক্ষীবাহিনী এবং চিকিৎসকদল এসে না পৌঁছচ্ছে।

ওর এইসব চিন্তার মধ্যেই বিশাল ভেলাটা এসে জেটিতে লেগেছিল। শ্রমিক-মেয়েদের তদারকিতে সীডাররা মোটা রশি দিয়ে টেনে ভেলাটাকে জেটির কাছে টেনে আনছিল। কেউ কেউ ভেলার গায়ে নামা-ওঠার জন্যে কাঠের পাটাতন লাগাচ্ছিল। সেরকমই একটা পাটাতন বেয়ে ভেলার সারেও নেমে এলেন জেটিতে। মাথার ক্যাপটা একটু তুলে সারমিনকে অভিবাদন জানালেন। সেই ক্যাপের মধ্যে থেকেই একটা মুখবন্ধ খাম বার করে তুলে দিলেন সারমিনের হাতে। শারমিন আর কোনওদিকে না তাকিয়ে খামের মুখটা ছিঁড়ে ভিতর থেকে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষার চিঠিটা বার করে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল সেটার ওপরে।

চিঠিটা পড়া শেষ হতেই সারমিনের মুখটা কালো হয়ে গেল। খুব সংক্ষিপ্ত উত্তরে অধ্যক্ষা জানিয়েছেন, শারমিনের বক্তব্যের গুরুত্ব তিনি বুঝেছেন। সীডারদের উদ্ভট আচরণের তদন্ত হওয়া খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু ইনস্টিটিউটের বেশিরভাগ চিকিৎসক এবং আরক্ষাকর্মী অধ্যক্ষা নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত, তাই কাউকে পাঠানো সম্ভব হল না। আর এক-সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। আশা করা যায় তিনিই এবারেও অধ্যক্ষা হিসেবে নির্বাচিতা হবেন। তখন তিনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। আপাতত সারমিনকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, সে যেন ইলিয়ানা গ্রামেই থেকে যায় এবং ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি হিসেবে ঘটনাবলির দিকে নজর রাখে।

পুনশ্চ হিসেবে অধ্যক্ষা যোগ করেছেন, যেহেতু পৃথিবীর অন্য কোথাও থেকে সীডারদের এই ধরনের আচরণের খবর পাওয়া যায়নি, তাই মনে করা হচ্ছে এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। শারমিন যেন খুব বেশি চিন্তিত না হয়। আর ওই লগবুকটি খুব সম্ভবত খ্যাপাটে মেয়েটির নিজেরই হাতের লেখা। ওটিকেও গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই।

হতাশ শূন্য দৃষ্টিতে সারমিন চারদিকে তাকালো। এই চিঠির অর্থ হয় এই যে, সে এখন অনির্দিষ্টকালের জন্য এই ইলিয়ানা গ্রামে বন্দি হয়ে রইল। ইনস্টিটিউটের নার্সারিতে রেখে আসা নিজের মেয়েদুটোর কথা মনে পড়ল শারমিনের। ওরা অবশ্য মাকে ছেড়ে থাকতে অভ্যস্ত, কিন্তু সে নিজেই এখনও মেয়েদুটোকে বেশিদিন ছেড়ে থাকতে পারে না। মন কেমন করে।

ভেলাটা ঘাটে ঠেকার সঙ্গেসঙ্গেই যেমন দলে-দলে মেয়ে আর সীডারে জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠেছিল, এখন আবার হঠাৎই তেমনই ফাঁকা হয়ে গেছে। এমনকি সারেং-মহিলাও তার দলবল নিয়ে নদীর পাড়ের উঁচু বাঁধ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে ইতিমধ্যেই বহুদূরে চলে গেছেন। ওঁরা আবার ফিরবেন পরশুর পরের দিন, ভেলার বুকে গন্ধকের বস্তা বোঝাই হলে, তারপর। শারমিন চিঠিটাকে খামে ভরে জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে ডাক দিল, চল রে মেয়ে। বাড়ি ফিরি।

কোনো সাড়া নেই। এত গন্ডগোলের মধ্যেও ধীরার মেয়েটা ঘুমিয়ে চলেছে নাকি! ঘাড় ফিরিয়ে জেটির যে-কোণাটায় মেয়েটা শুয়েছিল, সেদিকে তাকিয়েই বুকের ভিতরটা ভয়ে হিম হয়ে গেল শারমিনের। মেয়েটা নেই তো। কোথাওই নেই। তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে উঠল, ও কোথাও চলে যায়নি। মেয়েটা আসলে আর বেঁচে নেই।

কী যেন নাম ছিল মেয়েটার? কুশি? হ্যাঁ, হ্যাঁ। কুশি।

কুশিইই, কুশিইই ডাক ছাড়ল শারমিন।

কেউ সাড়া দিল না ।

জেটি ছেড়ে প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই উঁচু পাড়ে উঠে এল শারমিন। দেখল চার-পাঁচজন নারী-শ্রমিক একজায়গায় দাঁড়িয়ে খালি-বস্তার রাশি পাট করে সাজিয়ে রাখছে। সারমিন হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল, একটা বাচ্চা-মেয়েকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছ?

শারমিন যেহেতু সরাইখানায় থাকে, যে সরাইখানায় ওই মেয়ে শ্রমিকেরাও দুবেলা খাওয়া-দাওয়া করে, তাই তার মুখটা ওদের সবারই চেনা। তার পরিচয়টাও ওরা জানে। তাই শারমিনের মুখে উদ্বেগ দেখে ওরা বিচলিত হয়ে পড়ল। হাতের কাজ ফেলে এগিয়ে এল। বলল, না তো দিদি। আমরা তো অনেকক্ষণ ধরে এখানেই কাজ করছি। কোনও বাচ্চা মেয়েকে তো এদিক দিয়ে যেতে দেখিনি। তুমি কার কথা জিজ্ঞেস করছ?

শারমিন কোনও রকমে উত্তর দিল, কুশি। ধীরার মেয়ে। তারপর বাঁধ ধরে একবার এদিকে, একবার ওদিকে পাগলের মতন দৌড়তে শুরু করল।

ওই মেয়েগুলোও এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে কুশিকে খুঁজতে শুরু করল। ওরা সবাই মিলেই কুশির নাম ধরে ডাকছিল।

তারপর হঠাৎ একটা দৃশ্যের দিকে চোখ পড়তেই শারমিন পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে গেল। বুঝতে পারল, আর খোঁজাখুঁজির দরকার নেই।

নদীর তীর থেকে একটু দূরে, হলুদ জলের স্রোতে আস্তে আস্তে ভেসে চলেছিল একটা টুকটুকে লাল টুপি।

সেদিন সন্ধেবেলায় সরাইখানার খাবার ঘরে, সারমিনের ডাকে, গ্রামের মেয়েদের একটা জমায়েত হল। ধীরা আর তার বড় দুই মেয়ে বাদে আর সকলেই এসেছিল সেই সভায়। ধীরা না আসায় মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছিল শারমিন, কারণ, যে-কথাগুলো সে বলতে চাইছিল, সেই-কথাগুলো সেই সন্তানহারা মায়ের সামনে বলা বড় কঠিন হত তার পক্ষে।

বাকি জমায়েতের সামনে কিছুই গোপন করেনি সারমিন। কান্নায় ভেঙে পড়তে-পড়তে সে কবুল করেছিল, তার জন্যে... হ্যাঁ, তার জন্যেই কুশিকে মরতে হয়েছে। কুশিকে যে কাঁধব্যাগটা সে রাখতে দিয়েছিল, তার মধ্যেই ছিল বার্সো শিনজার লগবুক।

অনেকেই অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, সেই লগবুক জিনিসটা কী, যার জন্যে একটা মানুষ খুন হতে পারে।

সেটাও তাদের বুঝিয়ে বলল শারমিন। বলল, ওই লগবুকের লেখা সত্যি হলে এককালে সীডাররা সমস্ত কাজে তাদের মতনই কাবিল ছিল...মানে মেয়েদের মতন।

কথাটা কেউ বিশ্বাস করল, কেউ অবিশ্বাস করল। বেশিরভাগ মেয়েই সংশয়ে রইল। তবে তাৎক্ষণিকভাবে যে-প্রশ্নটা সবার ঠোঁটে চলে এল, সেটা হল, কুশিকে কে নদীতে ডুবিয়ে দিল।

সারমিন চোখের জল মুছে কঠিন-গলায় বলল, সীডাররা ছাড়া আর কে? সেদিন বিকেলে, যখন সবার চোখ আগুয়ান ভেলাটার দিকে নিবদ্ধ ছিল, তখনই তাদের মধ্যে কেউ জেটি থেকে ওকে জলে ফেলে দিয়েছে। বলা যায় না, হয়তো তার আগে মেয়েটাকে এমন আঘাত করেছে, যাতে ও মরার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। চিৎকার করতে না পারে।

কথাটা শুনেই ফেরিঘাটে যারা কাজ করে সেই মেয়েরা দাঁড়িয়ে উঠে সমস্বরে বলল, অসম্ভব। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আমরা সীডারদের নিয়ে কাজ করছি। আমরা জানি না ওরা কী পারে আর কী না পারে? দিদি, ওরা যে আমাদের আদেশ ছাড়া জল বেড়ে উঠলে পাড়ে অবধি উঠে আসতে পারে না; ওই বুকজল, গলাজলে দাঁড়িয়েই ডুবে মরে। ওরা মারবে অন্য একটা মেয়েকে! এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

শারমিন বলল, বুহিকে যে ওরাই মেরেছিল তার তো সাক্ষী আমরাই। আমি, ধীরা এমনকি কুশি অবধি সেদিন ছজন সীডারকে টিলার রাস্তা বেয়ে নেমে যেতে দেখেছিলাম। তাহলে এখন অবিশ্বাস করছ কেন?

শারমিনের কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা জোর ছিল যে, উপস্থিত মেয়েরা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপর দুয়েকজন আমতা-আমতা করে বলল, না দিদি, আসলে আমরা সারাদিন ওদের যেরকম দেখি, তার সঙ্গে খুনে চেহারাটা মেলাতে পারি না ।

আরেকজন সবার হয়ে জিজ্ঞেস করল, তাহলে আমরা এখন কী করব? ধরে ধরে সবকটা সীডারকে কালিং-এ পাঠিয়ে দেব?

কালিং এক নিষ্ঠুর প্রথা। স্টেট অনুমোদন করে না। তবে শারমিন জানে, ইনস্টিটিউট থেকে দূরবর্তী গ্রামগুলোতে লুকিয়েচুরিয়ে এই প্রথা চালানো হয়। শ্রমিক সীডারগুলি যখন অথর্ব হয়ে যায়, আর মাঠে বা কল-কারখানায় কাজ করার মতন শক্তি ধরে না, কিংবা প্রজননের সীডারগুলি যখন প্রজনন-ক্ষমতা হারায়, তখন তাদের মেরে ফেলা হয়। স্টেট সেটা জেনেও খুব কড়া স্টেপ নেয় না, কারণ, গ্রামের মেয়েদের আর্থিক অবস্থাটা পরিচালকেরা বোঝে। অকেজো পোষ্যদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোটা ওদের পক্ষে বিলাসিতা বলেই নাচার হয়ে কালিং-এর আশ্রয় নেয়।

‘কালিং’ শব্দটা শুনেই শারমিনের গাটা শিরশির করে উঠল। বলল, না না। এখনই অতদূর অবধি ভাবার দরকার নেই। শুধু আগামী দশটা দিন একটু সীডারদের ছাড়াই কাজ চালিয়ে নাও। জানি, তোমাদের কষ্ট হবে খুব। পরিশ্রম বাড়বে। কিন্তু তাছাড়া আর উপায় নেই। দশদিন বাদে ইনস্টিটিউট থেকে একটা টিম আসবে। সেই টিমে চিকিৎসকেরা থাকবেন, সুরক্ষাকর্মীরাও থাকবেন। তাঁরা ঠিক করবেন ওদের নিয়ে কী করা যায়। ততদিন অবধি ওদের একটু নজরে রাখা, এই আর কি।

একজন প্রৌঢ়া উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এখানকার সীড-ফার্মের ডিরেক্টর। আমাদের সিডিং প্রোগ্রামের কী হবে? এই ইলিয়ানা উপত্যকার গ্রামগুলিতে প্রতিদিন গড়ে পনেরোটি মেয়ে ফার্টাইল-পিরিয়ডে পৌঁছয়। সেইসময়ে তাদের মেটিং না হলে তারা গর্ভবর্তী হবে না। তাদেরও কি আমরা আটকে রাখব?

শারমিনের ভুরু কুঁচকে উঠল। এই প্রশ্নটা জটিল... খুব গুরুত্বপূর্ণ। চাষের কাজ দশদিন স্থগিত রাখা যায়। খনির মুখে দশদিনের গন্ধক জমলে ক্ষতি নেই, পরে ক্লিয়ার করে দেওয়া যাবে। কিন্তু ফার্টিলাইজেশন-প্রোগ্রামকে একদিনও থামানো যাবে না; স্টেটের কড়া হুকুম । এবং সেই হুকুমের পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। কোনও এক অজানা কারণে নারীর সফল গর্ভাধানের হার ইদানীং শতকরা হিসেবে মাত্র পনেরো পার্সেন্টে নেমে এসেছে। অর্থাৎ সঠিক সময়ে মেটিং হলেও একশোর মধ্যে মাত্র পনেরোটি ক্ষেত্রে সীডারের শুক্রাণু মেয়েদের গর্ভবতী করতে পারছে।

অথচ মৃত্যুর হার তার থেকে অনেক বেশি। অপুষ্টি আর অসম্ভব পরিশ্রমের জীবনই তার জন্য দায়ী। তাছাড়া রয়েছে দফায় দফায় বিভিন্ন এপিডেমিকের আক্রমণ। এই তো, মাত্র দুবছর আগেই প্লেগের আক্রমণে রাশিয়ার ইনস্টিটিউটের অধীন দুটি শহরের প্রায় পঁচিশ হাজার নারী-পুরুষ একমাসের মধ্যে ফৌত হয়ে গেল।

এই অবস্থায় ফার্টিলাইজেশন প্রোগ্রাম থামাতে বলা মানে স্টেটের বিরুদ্ধে একপ্রকারের বিদ্রোহ ঘোষণা করাই। সেই ঝুঁকি কি নিতে পারে সারমিন ?

তাছাড়া... সে ভেবে দেখল, সীড-ফার্মের পুরুষদের পক্ষে কারুর অনিষ্ট করার সুযোগ একেবারেই নেই। ওরা নিঃসঙ্গ, নিরস্ত্র। এমনকি মেটিং-এর সময়েও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেই ওখানে। যদি বা ধরেও নেওয়া যায়, একদল পুরুষ তাদের চিন্তা-চেতনা ফিরে পেয়েছে এবং কোনওভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রাক্-তুষারযুগের স্মৃতিকে আটকাতে, তাহলেও তারা সীড-ফার্মের ভিতরে সেই বার্তা পৌঁছবে কেমন করে?

খুব দ্রুত এই চিন্তাগুলোকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে শারমিন উত্তর দিল, সীড-ফার্ম যেমন চলছিল তেমনই চলবে।

তারপর সীড়-ফার্মের ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার নিজেরই আর চার-দিন বাদে মেটিং-এর ডেট ছিল। তার মধ্যে ইনস্টিটিউটে যখন ফিরতে পারছি না, তখন আপনি এখানেই একটু ব্যবস্থা করে দিন।

চার-দিন বাদে যে ওর উর্বর-দশা শুরু হচ্ছে, সেই সময় যে ওর ডিম্বাণু অপেক্ষা করবে শুক্রাণুর জন্যে, সে-কথাটা মিথ্যে নয়। শারমিন কাজের দোহাই দিয়ে এবারেরটা এড়িয়ে যেতেও পারত ; কিন্তু ভেবে দেখল, ও যদি সীড-ফার্মে পা রাখে, তাহলে অন্য মেয়েদের আস্থা বাড়বে। তাই এরকম সিদ্ধান্ত নিল।

৭

রাত প্রায় ভোর হতে চলেছে। সীড-ফার্মের কাজ আজকের মতন শেষ হয়েছে। দুজন অ্যাটেন্ডেন্টের মধ্যে যিনি বয়স্কা, তিনি বাড়ি ফিরে গেছেন। অল্পবয়সি মেয়েটি এবার সীডারদের ঘরগুলোর দরজায় তালা লাগাতে শুরু করল। তবে সবকটা ঘরের দরজায় গা-তালা নেই।

আসলে ব্যারাকবাড়িটার বয়স একশো বছরের কাছাকাছি। বাইরে রঙের পোঁচ পড়লেও ভিতরে ভিতরে জীর্ণ হয়েছে। অধ্যক্ষা কয়েকবার গ্রামসভার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যাতে বাড়িটিকে এবার একবার পুরোপুরি সারানো হয়। যদি সেই কাজটা এখন নাও করা যায়, অন্তত দরজা জানলাগুলো অবিলম্বে সারানো হোক। কিন্তু পয়সার অভাবে তার কোনও প্রার্থনাই মঞ্জুর হয়নি। উলটে তাকে বলা হয়েছিল, তার কাজটা তো সবচেয়ে নিরীহ প্রাণীদের নিয়ে। গরু-ছাগলেরাও মাঝে-মাঝে খোঁয়াড় ভেঙে পালায়, কিন্তু কোনও সীডারকে কেউ কোনওদিন পালাতে দেখেনি। নেহাত মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্যে তাদের ঘরে দরজা লাগাতে হয়, তা সে তো ভেজিয়ে রাখলেই চলে। তালা দেওয়ার দরকারটাই বা কী?

কুড়িটার মধ্যে চারটে ঘরের দরজার তালা নষ্ট হয়ে গেছে। অ্যাটেন্ড্যান্ট মেয়েটি বাকি ষোলোটা ঘরের দরজা লক করে আবার নিজের টেবিলে ফিরে এল। আজকের মতন তার কাজ শেষ। এবার অপেক্ষা দিনের পরিচারিকাদের জন্যে। সকাল আটটা নাগাদ তারা এসে ঘর পরিষ্কার করবে। পরিষ্কার করবে ঘরের বাসিন্দা কুড়িটি সীডারকেও। তাদের চান করাবে, পোশাক বদলে দেবে, খাওয়াবে। পরেরদিন রাত অবধি সীডারদের বিশ্রাম।

রাত নামলে আবার তারা সঙ্গমে রত হবে।

বসে থাকতে-থাকতে টেবিলের ওপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটি। সে জানতেও পারল না, কুড়িটি কেবিনের মধ্যে একটির ভিতরে কি অদ্ভুত এক কাণ্ড শুরু হল।

কেবিন-নম্বর দুই। ওই কেবিনের সীডারটির বয়স ত্রিশের কাছাকাছি । লম্বা একহারা চেহারা । চুল এবং চোখের মণি কালো। সে একজন 'প্রাইজ-সীডার'। অর্থাৎ এখনো অবধি ইলিয়ানা গ্রামে তার সঙ্গে সঙ্গমের ফলে শিশু-জন্মের হার সবচেয়ে বেশি। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মেয়ে দুই-নম্বর সীডারের সঙ্গে সঙ্গমের পরে গর্ভবতী হয়েছে।

এই দুই-নম্বর সীডারই হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। এতক্ষণ অবধি সেও অন্যান্য সীডারদের মতনই নির্জীব হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল। তাই তো থাকে ওরা। শুধু খাদ্য অথবা নারী দেখলে ওদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা যায়। কিন্তু এখন এই ভোররাতে না আছে নারী, না আছে খাদ্য। তাহলে কেন ওই সীডারটি কনুইয়ের ওপরে ভর দিয়ে উঠে বসল ?

শুধু তাই নয়। আশ্চর্যজনকভাবে এখন তার চোখে সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। চোয়াল হয়ে গেছে শক্ত। এমনকি নাকের পাটা-দুটোও এমনভাবে ফুলে-ফুলে উঠছে যে, মনে হচ্ছে সে যেন কিছু ঘ্রাণ পাচ্ছে।

সীডারটি খুব সতর্কভঙ্গিতে, পা টিপে টিপে, তার ঘরের দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল। দেখল, অ্যাটেন্ড্যান্টটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে পা টিপে-টিপেই ব্যারাকবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। গুঁড়ি মেরে ঝোপঝাড়ের আড়াল ধরে পেরিয়ে গেল একফালি বাগানটাও। এবং সেই বাগান থেকেই একটা ভেঙে পড়া গাছের ডাল কুড়িয়ে নিল। ডালটা বেশ মোটা এবং বেঁটে। মুগুর হিসেবে দিব্যি ব্যবহার করা যায়।

তখনও সূর্য ওঠেনি। উপরন্তু ভোরের আগে পাশের জলাজমি থেকে চাপ-চাপ কুয়াশা উঠে এসে জায়গাটাকে পুরোপুরিই ঢেকে দিয়েছিল। সেই কুয়াশার আবরণ সরিয়ে কিছু দেখা মুশকিল। তবে দুই-নম্বর

সীডার চোখের ওপরে ভরসা করছিল না। সে হাতের ডালটাকে বাগিয়ে ধরে অবিকল এক শিকারী কুকুরের মতন গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে চলেছিল।

বেশিদূর যেতে হল না। ব্যারাকবাড়িটাকে ছাড়িয়ে সামনের রাস্তা ধরে আর বড় জোর দুশো-মিটার যেতেই সে লোকটাকে দেখতে পেল।

সে নিজে দেখতে পেল বলা ভুল। তার মাথার মধ্যে বসে কারা যেন সব কিছু দেখছিল। তাদের চোখ দিয়েই সেও লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিল। অবশ্য দেখতে পেলেও সে তাই নিয়ে কিছু ভাবছিল না। আসলে তার তো কিছু ভাবার ক্ষমতাই ছিল না। বহু বছর আগে কালো বরফের এক প্রপাত নেমে এসেছিল পৃথিবীতে। তারপর থেকে পৃথিবীর কোনও পুরুষেরই আর ভাবার ক্ষমতা নেই। দুই-নম্বর সীডারই বা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কীভাবে?

ওর অন্তর্গত সেই ক্ষুদ্র অস্তিত্বগুলিই তাকে সেদিন ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিল। নির্দেশ দিয়েছিল, দরজার কাছে যাও! দেখো, মেয়েটি ঘুমোচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, এবার বাইরে বেরিয়ে পড়ো। হাতে তুলে নাও ওই মোটা গাছের ডালটা।

সেই অস্তিত্বগুলিই তাকে বলল, গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাও ওই লোকটির পেছনে । এবার ওকে আঘাত করো ! জোরে.... খুব জোরে । যেন এক আঘাতেই ওর মাথাটা গুড়িয়ে যায়।

বার্সো শিনজা প্রতিদিনই এই ভোর হওয়ার আগের সময়টায় ওর টিলার আস্তানা ছেড়ে গ্রামে নেমে আসে। বুঝতে চায় এখনকার পরিস্থিতিটাকে । দেখতে চায় কোথাও একজন স্বাভাবিক পুরুষমানুষের পা রাখবার মতন এক চিলতে জায়গাও পড়ে আছে কিনা। আজকেও সেই উদ্দেশ্যেই সে হেঁটে যাচ্ছিল।

যাবার পথে সে অন্যমনস্কভাবেই সীড-ফার্মের বাড়িটাকে পেরিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে উঠল, সাবধান। বার্সো চোখের কোণ দিয়ে দেখল তার ঠিক পেছনেই এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তি যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসছে। সে আর কিছু না ভেবেই মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে সেই একই গতিতে পা দুটো দিয়ে যত জোরে পারে পেছনের লোকটার পায়ে আঘাত করল।

লোকটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ার আগেই বার্সো আবার স্প্রিং-এর মতন সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর আততায়ীকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল।

বার্সো দেখে নিয়েছিল লোকটার হাতের মোটা ডালটা ইতিমধ্যে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেছে। নিরস্ত্র লোকটাকে মারার কোনও ইচ্ছে ছিল না বার্সোর। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল তার হাতের মধ্যেই লোকটার শরীরটা কয়েকবার কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

লোকটা যে সীড-ফার্ম থেকে বেরিয়ে এসেছে, সে যে একজন সীডার, সেটা ওর পায়জামা আর শার্টের মতন ইউনিফর্ম থেকেই বুঝতে পারছিল বার্সো।

কিন্তু বার্সো শপথ করে বলতে পারে, সে এই সীডারটিকে মারেনি। এমনকি তাকে মাটিতেও পড়তে দেয়নি। তবু সীডারটি মরে গেল। এমনভাবেই তার শরীর থেকে মুহূর্তের মধ্যে প্রাণের সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে গেল যে, বার্সোর মনে হল একটা সার্কিটের মাঝখান থেকে কেউ একটা ফিউজ খুলে নিল।

পুরো ঘটনাটায় বার্সোর স্নায়ুগুলো এত জোরে ঝাঁকুনি খেয়েছিল যে, তার হাত-পা কাঁপছিল। কিন্তু একইসঙ্গে সে এটাও বুঝতে পারছিল, এখন সময় নষ্ট করার মতন সময় তার হাতে নেই। এই অবস্থায় সে যদি ইলিয়ানা

গ্রামের মেয়েদের হাতে ধরা পড়ে তাহলে তার কপালে দুঃখ আছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে সে এটুকু বুঝেছে যে, এখনকার পৃথিবীতে এই সীডারগুলির দাম সোনার চেয়েও বেশি, কারণ এরা আর কিছু না পারলেও জন্ম দিতে পারে। তেমনই এক অমূল্য সীডারকে সে ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছায়, খুন করেছে। কাজেই ধরতে পারলে তাকেও ওরা বাঁচতে দেবে না।

বার্সোর মাথাটা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে এল। সে ভেবে দেখল তার প্রথম কাজ এখন এই মৃতদেহটিকে লুকিয়ে ফেলা। সৌভাগ্যক্রমে তার একটা উপায়ও বার্সোর হাতের কাছেই মজুত ছিল। রাস্তার ধারেই টাল করে রাখা ছিল বাতিল খনিজ গন্ধকের রাশি। একটা ঢিপির চেহারা নিয়েছিল জায়গাটা। কাছাকাছি কয়েকটা কোদালিও পড়েছিল। বোঝাই যায়, ফেরিঘাটে নিয়ে যাওয়ার আগে এখানেই ঝাড়াই-বাছাই করে গন্ধকের গুঁড়োকে বস্তাবন্দি করা হয়।

বার্সো প্রায় আধঘণ্টার পরিশ্রমে সেই গন্ধকের ঢিপির মধ্যে একটা গভীর গর্ত খুঁড়ে ফেলল। কাজটা করার সময় তার কেবলই ভয় হচ্ছিল যদি কেউ কোদাল চালানোর শব্দ শুনতে পেয়ে এগিয়ে আসে। যদি সে ধরা পড়ে যায়। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেই রাতের ঘন কুয়াশা শব্দ এবং দৃশ্য দুটো জিনিসকেই অনেকটা চাপা দিয়ে দিয়েছিল।

বার্সো দেখেছে মানুষের মাথায় ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়াগুলো আসে একেবারেই হঠাৎ করে। চিন্তাভাবনা করে ওসব আইডিয়া বার করা যায় না। সীডারের শরীরটা সে যখন গন্ধকের কবরের মধ্যে নামিয়ে দেবার জন্যে কাঁধে তুলেছে, ঠিক তখনই তার মাথায় এরকম একটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া ঝলসে উঠল। বার্সো চটপট নিজের সেই ফলের রসে রাঙানো পোশাক খুলে ফেলে সীডারের পোশাকটা নিজের গায়ে চাপিয়ে নিল। তারপর সীডারের মৃতদেহটা কবরের মধ্যে নামিয়ে দিল। একই কবরে নিজের ছেড়ে ফেলা জ্যাকেট ট্রাউজার ইত্যাদি বান্ডিল বেঁধে ফেলে দিয়ে ভালো করে গন্ধকের গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে দিল পুরোটাই।

ও হ্যাঁ, মৃতদেহটাকে কবর দেওয়ার আগে বার্সো রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটা কাস্তে কুড়িয়ে এনে, মৃতদেহটার মাথা থেকে একগুছি চুল কেটে নিজের পকেটে লুকিয়ে রাখল।

বার্সো সবে যখন ভাবছে এইবার তার পক্ষে এই গ্রামের যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো সহজ হবে, শুধু চোখেমুখে একটু হাবা-ক্যাবলার ভাব ফুটিয়ে রাখতে পারলেই সে সীডারদের এই ইউনিফর্মের কল্যাণে মিসে যেতে পারবে যে-কোনও লেবারের দলে, ঠিক তখনই সে ধরা পড়ে গেল। তবে তাকে যারা ধরল, সেই অ্যাটেন্ড্যান্ট মেয়ে দুটি বুঝতেও পারল না যে, তারা সেই পালিয়ে-যাওয়া সীডারকে ধরল না। ধরল এক মহাকাশ ফেরত বুদ্ধিমান পুরুষকে, যার নাম বাসো শিনজা। বার্সো ওদের ভুল ভাঙাল না।

৮

পরের দিন রাত দশটা নাগাদ সীড়-ফার্মের দরজা ঠেলে ভিতরে পা দিল শারমিন। আজকেই তার ঋতুচক্রের মধ্যে উর্বরতম দিন। তাই আজ থেকে পরপর চারদিন সে মেটিং-এর জন্য ডেট নিয়ে রেখেছিল।

ওকে ঢুকতে দেখেই অ্যাটেন্ড্যান্ট মেয়েদুটি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। ওর হাতে ধরিয়ে দিল খুব খাটো-দৈর্ঘ্যের স্বচ্ছ রাতপোশাক। পোশাক পরিবর্তন করে আসতেই একটি মেয়ে ওকে নিয়ে সীডারের কেবিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শারমিনের ভুরুদুটো একটু কুঁচকে গেল। দরজার গায়ে একটা চৌকোনা টিনের পাতে নম্বর লেখা আছে পনেরো।

সে বেশ অসন্তুষ্ট সুরেই অ্যাটেন্ড্যান্ট মেয়েটিকে বলল, তোমাদের অধ্যক্ষা আমাকে বলেছিলেন, দু'নম্বর প্রাইজ-সীডারের সঙ্গে আমার মেটিং-এর বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। দেখো মেয়ে, ব্যাপারটা খুব জরুরি। আমার বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে। এর আগে অনেকগুলো মেটিং-এ... ।

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই মেয়েটি তাড়াহুড়ো করে বলল, না ম্যাডাম, এটিই দু'নম্বর সীডার। কাল রাতে ও ফার্মের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল বলে ওর রুমটা আমরা চেঞ্জ করে দিয়েছি। দু'নম্বর কেবিনের লকটা খারাপ তো, তাই।

বেরিয়ে গিয়েছিল! ভারী অবাক হয়ে বলল সারমিন। এরকম প্রায়ই বেরিয়ে যায় নাকি ?

মেয়েটি উত্তর দিল, না ম্যাডাম। তবে দরজা খোলা পেলে কি করত বলা মুশকিল। এই প্রথম আমরা দরজায় তালা না লাগিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। হয়তো সেইজন্যেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

শারমিন আর কথা না বাড়িয়ে ঘরটায় ঢুকে গেল। তারপর ভিতর থেকে দরজার পাল্লাদুটো ভেজিয়ে দিয়ে সীডারটার দিকে তাকালো। তাকাতেই ওর মাথাটা গরম হয়ে গেল। এই অ্যাটেন্ড্যান্ট মেয়েদুটি যে একেবারেই অপদার্থ তাতে সন্দেহ নেই। মেটিং এর আগে সীডারের পোশাক খুলিয়ে নগ্ন করে দেওয়াটা ওদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সেই কাজটা যে ওরা করেনি তা তো দেখাই যাচ্ছে। পুরো পোশাক পরে ঘরের এক কোনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা।

‘ওদের কি ডাকব? ডেকে বলব এর পোশাক খুলিয়ে দাও' ভাবল শারমিন। তারপর ঠিক করল, দরকার নেই। কাজটা ও নিজেই পারবে। তাতে আরেকটা সুবিধে হবে, ছেলেটা ওর হাতের ছোঁয়ায় তাড়াতাড়ি উত্তেজিত হয়ে উঠবে।

শারমিন ছেলেটার দিকে এগিয়ে যেতেই ছেলেটা সঙ্কুচিত হয়ে পিছিয়ে গেল। শারমিনও অবাক হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। এই নাকি প্রাইজ-সীডার ! এ এরকম লাজুকতা দেখাচ্ছে কেন? হিসেব মতন তো এর এখনই লাফিয়ে এসে শারমিনকে জড়িয়ে ধরার কথা। সারমিন একবার ছেলেটির মাথা থেকে পা অবধি জরিপ করল।

ছেলেটি যে সুপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই। সরু কোমর, চওড়া বুক, দীর্ঘ উরু। এর বীর্য যে মেয়েদের জন্ম হবে তারা নিশ্চয়ই সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতি হবে। যদি ছেলে হয়, তারা হবে ভবিষ্যতের প্রাইজ-সীডার।

কিন্তু তার জন্যে আগে তো একে মৈথুনের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। শারমিন ছেলেটির উরুসন্ধির দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল ওর লিঙ্গের সামান্যতম উত্থান ঘটেনি। গন্ডগোলটা কোথায়? শারমিন ওর পাজামার কোমরের দিকে হাত বাড়াল।

ছেলেটা আরও এক পা পিছিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, চেঁচিয়ে উঠবেন না। শান্তভাবে যা বলছি শুনুন। আমি সীডার নই।

ভাগ্যিস ছেলেটি প্রথমেই ওকে চেঁচাতে বারণ করেছিল। নাহলে সত্যিই শারমিন বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠত। কারণ এই প্রথম সে কোনও পুরুষের মুখে মানুষের ভাষা শুনল।

শুধু মুখে মানুষের ভাষা নয়, ছেলেটির চোখদুটিও কথা বলছিল। এরকম ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ কোনও পুরুষের হয় বলে শারমিন জানত না । আজই প্রথম জানল।

প্রায় এক-মিনিট সময় নিল সারমিন নিজেকে সামলাতে। তারপর প্রথম যে-কাজটা করল, সেটা হল, হাত বাড়িয়ে ভেতর থেকে ঘরের ছিটকিনিটা তুলে দিল। তারপর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সারমিন বলল, আন্দাজ করতে পারছি তুমি কে। বার্সো শিনজা। ঠিক বলছি?

বার্সো বলল, একদম ঠিক। আমিও তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। তুমি এই গ্রামের মেয়ে নও। এদের চেয়ে অনেকটাই বেশি জানো, অনেকটাই বেশি বোঝো তুমি। ভালোই হল তোমাকে পেয়ে।

শারমিনের বিস্ময় তখনো কাটছিল না। সে বিড়বিড় করে বলল, আমার নাম সারমিন। ইনস্টিটিউটের ইনভেস্টিগেটর। কিন্তু... আচ্ছা, সত্যিই কি তুমি আমাদের মতন? তুমি অঙ্ক জানো? ভূগোল? ইতিহাস ?

বার্সো হেসে ফেলল। বলল, কিছু মনে কোরো না শারমিন। তোমাদের চেয়ে অনেকটাই বেশি জানি। কারণ, আমি জন্মেছিলাম এবং বড় হয়েছিলাম কালো বরফের আগের পৃথিবীতে। তখন মানুষের ভূগোল পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাবিশ্বে বিস্তার পেয়েছিল। অন্তত দশ লক্ষ বছরের ইতিহাস ছিল আমাদের পেছনে। তোমাদের মতন এই পাঁচশো-বছরের ইতিহাস নয়। আর অঙ্ক? ছেড়ে দাও, ও তুমি ভাবতে পারবে না।

এখানে ঢুকলে কীভাবে?

বার্সো আগের রাতে যা-যা হয়েছে সবটাই শারমিনকে বলল ।

সারমিন সব শুনে বলল, এটাও এক রহস্য। নির্বোধ সীডাররা কীভাবে তোমার উপস্থিতি টের পাচ্ছে? কীভাবে তোমার সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছু ওরা নষ্ট করে ফেলছে?

মানে? শারমিনের কথাগুলোর অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না বার্সো। তখন শারমিন ওকে বুঝিয়ে বলল, কীভাবে কয়েকজন সীডার মিলে বৃহিকে খুন করেছে। এই ঘটনাটার কথা যদিও বার্সো জানত, তবু বৃহির কাছেই যে ওর লগবুকটা ছিল আর সেটা যে বৃহি শারমিনের হাতে তুলে দিয়েছিল, এত কথা ও জানত না।

কুশিকে ওরা কীভাবে খুন করেছে এবং সেইসঙ্গে লোপাট করে দিয়েছে বার্সোর লগবুক, সেকথাও ওকে বলল শারমিন।

আর শেষ অবধি কাল তো খোদ বার্সোকেই ওদের মধ্যে একজন পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

এটা ওরা কীভাবে পারছে, বার্সো? অসহায়ের মতন জানতে চাইল শারমিন ।

বার্সো ততক্ষণে শারমিনের সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে বিছানার একপাশেই বসে পড়েছিল। শারমিনের প্রশ্নটা শুনে ও খুব চিন্তিতমুখে বলল, রিমোট-কন্ট্রোলের মতন একটা কিছু ব্যাপার ঘটছে। এই যে কাল রাতে সীডারটি আমার চোখের সামনে মরে গেল, তখনও আমার মনে হয়েছিল, কেউ যেন রিমোট-কন্ট্রোলে ওর ভিতরের কিছু ফাংশন অফ করে দিল ।

রিমোট-কন্ট্রোল মানে কী?

তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলব। আপাতত এইটুকু বলি শারমিন, তোমার বিপদ আমার চেয়ে কিছু কম নয়। কেউ বা কারা যদি কালো বরফের আগের সভ্যতাকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে, তাহলে তুমিও ওদের কাছে বিপজ্জনক। কারণ, তুমিও এমন সভ্যতার অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে জেনে গেছ।

শারমিনের চোখেমুখে ভয় ফুটে উঠল। ও বলল, সেটা আমিও বুঝতে পারছি। হয়তো এতদিনে আমাকে মেরেই ফেলত, যদি না জানত আমার পেছনে ইনস্টিটিউট রয়েছে। আমাকে মারলে এই গ্রামের প্রতিটি সীডারের মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা হয়তো ওরা চাইছে না।

তারপর একটু থেমে শারমিন বলে উঠল, কিন্তু এই 'ওরা' মানে কারা? আমি তো সাধারণ মেয়েদের দল আর সাধারণ সীড়ার ছাড়া আর কাউকেই কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

বার্সো পাজামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে মৃত সীডারের চুলের গুছিটা বার করে এনে মন দিয়ে সেগুলো দেখতে-দেখতে বলল, এগুলো অনেককিছু বলতে পারত। কিন্তু তার জন্যে তো আমাকে আমার ক্রুজারের কাছে ফিরতে হবে। এরা তো আমাকে ঘরে তালা দিয়ে রাখছে।

শারমিন উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল। বলল, ও নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি তোমাকে বার করে নিয়ে যাব। এখন পরপর চার রাত্রি তুমি শুধু আমার। সেইভাবেই তোমাকে বুক করা আছে। আমি বলব তোমাকে আমি সরাইখানার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তেমন করা যায়, নিয়মে আটকায় না ।

তারপর? প্রশ্ন করল বার্সো।

তারপর আবার কী? আমরা সরাইখানা থেকে টিলার ওপরে তোমার ক্রুজারের কাছে চলে যাব। এখানে থাকাটা তো আমার পক্ষেও নিরাপদ নয়।

তারপর? ওরা যখন খুঁজতে বেরোবে?

শারমিন বলল, তার মধ্যে একটা কোনও রাস্তা খুঁজে পাব নিশ্চয়ই। তখন

তোমাকে সবার সামনে বার করতে অসুবিধে হবে না।

বার্সো বলল, রাস্তা! কীসের রাস্তা?

পৃথিবীর সমস্ত সীডারকে তোমার মতন পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার রাস্তা। উত্তর দিল শারমিন।

ঠিক এইসময়েই বাইরে থেকে দরজায় শশব্যস্ত টোকা পড়ল। সঙ্গে উদ্বিগ্ন গলার আওয়াজ; ম্যাডাম, ম্যাডাম! আপনি ঠিক আছেন তো? এত দেরি হচ্ছে কেন? একি! ভিতর থেকে দরজা লক করেছেন কেন?

শারমিন উত্তর দিল, একদম ঠিক আছি। চিন্তা কোরো না।

তারপর বার্সোর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, কাল রাতে আবার আসছি। আর ইয়ে...।

কী ?

এই সামান্য কথাটা বলতে ওর সঙ্কোচ হচ্ছে দেখে শারমিন নিজেই অবাক হল । তারপর সেই সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল, তুমি প্লিজ ইউনিফর্মটা খুলে ফেলো এবং বিছানায় শুয়ে পড়ো। ওরা যদি দরজা খুলে দেখে, তুমি পোশাক পরে রয়েছ, তাহলে বলা যায় না, তোমাকে বাতিল বলে কালিং-এর জন্যে পাঠিয়েও দিতে পারে ।

অসম্ভব। বার্সো ঘাড় নাড়ল। তোমার সামনে নয়।

আমি মুখ ঘুরিয়ে থাকছি। তুমি হ্যাঁ বললে আমি দরজা খুলব।

শারমিন দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়েই শুধু দাঁড়াল না, নিজের ছোট স্কার্টটাকে বারবার দু-হাত দিয়ে টেনে উরুদুটো আড়াল করবার চেষ্টা করতে লাগল। পুরুষের দৃষ্টির সামনে এই লজ্জাবোধ তার কাছে একেবারেই নতুন।

পুরো পৃথিবীতেই নতুন। পাঁচশো বছর বাদে এই লজ্জাবোধ আবার পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এল।

জামাকাপড়ের খসখস আওয়াজ। একটু বাদে বাসো চাপা গলায় বলল, হ্যাঁ। হয়েছে।

শারমিন পেছনদিকে না তাকিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর নার্সের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এই দু-নম্বর সীডারকে কাল রাতে সরাইখানায় আমার ঘরে নিয়ে যাব। সেইভাবে কাগজপত্র তৈরি

রেখো।

৯

খুব ঘনঘন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে থাকলে বোধহয় একটা সময়ের পর মানুষের অবাক হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে যায়। শারমিনের এখন ঠিক তাই হয়েছে।

এই-মুহূর্তে ও আর বার্সো ক্রুজারের ভিতরে বসে আছে। আরো অনেক কিছুর মতই এই ক্রুজারের ভিতরের তাপমাত্রা আর আলোর ঔজ্জ্বল্যকে নিয়ন্ত্রণ করে গাইডিং অমনিপোটেন্ট ডিভাইস, সংক্ষেপে গড়। তাই ক্রুজারের মসৃণ সেরামিক-দেয়াল ওরা ঢোকার সঙ্গেসঙ্গেই মৃদু গোলাপি আলোয় স্বয়ংপ্রভ হয়ে উঠেছিল। বাইরে মধ্যরাত্রির হিমশীতল হাওয়া বইলেও, ক্রুজারের ভিতরে আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছিল।

শারমিন তার চৌত্রিশ বছরের জীবনে গ্যাসের আলো থেকে ফিলামেন্ট বাল্বে উত্তরণ দেখেছে। সে দেখেছে বালি-সিমেন্টের গাঁথনি এসে কীভাবে চুন-সুড়কির গাঁথনিকে সরিয়ে দিয়েছে। এইসব নিয়েই সে ভীষণ গর্বিত ছিল। সে ভাবত তাদের ইনস্টিটিউটের জন্যেই মাত্র পাঁচশো বছরের সময়কালে আদিম কিছু মানুষ এতখানি সভ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ ক্রুজারের অভ্যন্তরটুকু দেখেই সে বুঝতে পারছিল, কালো বরফের অভিশাপ নেমে আসার আগে মানবসভ্যতা যে উচ্চতায় পৌঁছেছিল, সেখানে পৌঁছতে তাদের অন্তত আরও একহাজার বছর লাগবে। তাও পারবে কিনা জানে না।

প্রথমটায় সে ক্রুজারের ভেতরে ঘোরাঘুরি করতে ভয় পাচ্ছিল, যদি অজান্তে কোনও মেশিনে হাত লেগে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যায়। যদি এই উড়ুক্কু গাড়িটা সাঁ করে আবার মহাশূন্যে উড়ে যায়। তাই শুনে বার্সো হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, প্রথমত পুরো ক্রুজারে তুমি একটা সুইচও কোথাও দেখতে পাবে না। রয়েছে সবই, তবে কনসোলের আড়ালে। প্রয়োজন মতন বেরিয়ে আসে।

সত্যিই তাই। ক্রুজারের ভিতরটা ঠিক একটা ডিমের খোলার মতন ভাঁজহীন, মসৃণ। তবে একবার শারমিন যখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে বার্সোকে জিজ্ঞেস করেছিল বসব কোথায়, তখনই দেয়ালের ভিতর থেকে খুব সুন্দর একটা গদি মোড়া চেয়ার বেরিয়ে এসেছিল। তারপর যখন ওর জলতেষ্টা পেল, তখন সারমিন আর বার্সোকে কিছু বলেনি। দেয়ালকেই বলেছিল একটু জল খাওয়াও এবং সঙ্গেসঙ্গেই এক যান্ত্রিক হাত ঝকঝকে

গ্লাসে পরিষ্কার জল এগিয়ে দিয়েছিল। ওর জল খাওয়া শেষ হলে হাতটা আবার খালি গ্লাসটা নিয়ে দেয়ালের গায়ে মিলিয়ে গিয়েছিল।

বার্সো ক্রুজারের একপ্রান্তে বসে মন দিয়ে কিছু কাজ করে চলেছিল। কাল রাতে ও আর সারমিন সরাইখানার ঘর থেকে পালিয়ে চলে এসেছিল টিলার গহনে, যেখানে ক্রুজারটা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তারপর থেকে ও একটানা কাজ করে চলেছে। ওর সামনে বিশাল এক কনসোল খুলে গেছে। অজস্র রোবট হাত এবং রোবট চোখ নিখুঁত ছন্দে সেই কনসোলের ওপরে ঘোরাঘুরি করছে, যেন খুব নিয়মানুবর্তী এক মৌচাকের গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি।

শারমিন একটা আরামদায়ক চেয়ারে বসে এতক্ষণ চুপ করে ওর কাজ দেখছিল। বার্সো যে এতক্ষণ তার দিকে না তাকিয়ে উলটোদিকে মুখ ঘুরিয়ে কাজ করে চলেছে, এতে তার মনে ঈর্ষার জন্ম হচ্ছিল। সে চাইছিল ওর মনোযোগ। একটা সময় আর না পেরে ও বলে বসল, কী করছ তুমি এত মন দিয়ে?

মুখ না ফিরিয়েই বার্সো বলল, আমি তেমন কিছুই করিনি। আমি শুধু গড অর্থাৎ যাকে হয়তো তুমি সুপার-কম্পিউটার বললে বুঝবে...

না, আমি তাও বুঝতে পারছি না। ক্ষুব্ধস্বরে উত্তর দিল শারমিন। বার্সো বলল, স্যরি! তাহলে মনে করো এমন এক মেশিন, যার পেটের মধ্যে মানুষের সমস্ত জ্ঞান ভরে দেওয়া আছে এবং যে সেই জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে নিজে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আচ্ছা আচ্ছা, বুঝলাম। তা তুমি ওই গডকে নিয়ে এতক্ষণ ধরে কী করছ? আমি গডকে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, শারমিন। খুব বেশি ইনপুট দিতে পারিনি। ওই মৃত সীডারের চুলের গুছিটা ওর অ্যানালিসিসের জন্যে দিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কালো তুষারের রহস্য কী?

তারপর? উত্তর পেলে?

না, এখনও পাইনি। তবে এবার বোধহয় পাব।

বার্সোর কথাটা শেষ হতে না হতেই কনসোলের ওপরে একটা সবুজ আলো দপ দপ করে কয়েকবার জ্বলে উঠল।ঘূর্ণমান রোবট হাত ও রোবট চোখগুলো কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল আর একটা স্লটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল ছাপা কাগজের ফালি। ফালিটা পুরোপুরি বেরিয়ে আসার পরে বার্সো সেটা হাতে নিয়ে শারমিনের পাশে গিয়ে বসল; মানে, বসার ইচ্ছে প্রকাশ করতেই ওখানে একটা চেয়ার এসে হাজির হল।

তার ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে বার্সো বলল, আগেকার দিন হলে এখন দুজনে দু-কাপ চা খেতে খেতে এটা দেখতে পারতাম। কিন্তু দুঃখিত । আমাকে খাবার জলটুকুও এখন বাইরে থেকে জোগাড় করে আনতে হয়। এজারের স্টক অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে।

শারমিন বলল, দরকার নেই। তুমি পড়ো কী লিখেছে।

গডের সেই পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত বড় অদ্ভুত। বার্সো পড়ে চলল; আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে টানা পনেরো-দিন ধরে সারা পৃথিবীতে অবিরাম তুষারপাত ঘটেছিল। কালো তুষার। পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি জমি, প্রতি স্কোয়ার ফুট অরণ্য, মরুভূমি এবং সমুদ্র ঢেকে গিয়েছিল কালো বরফের পুরু চাদরে। কোথাও কোথাও সেই বরফের চাদর ছিল চার-পাঁচতলা বাড়ির সমান পুরু।

স্থির ছিল না সেই বরফের চাদর। মাধ্যাকর্ষণের টানে যেখানে যতটুকু জমির ঢাল ছিল, পাহাড়ের ঢাল ছিল, সবকিছু বেয়ে হিমবাহের মতন এগিয়ে গিয়েছিল কালো বরফের প্রবাহ।

ওই পনেরো-দিনের মধ্যেই তখনকার জনসংখ্যার নিরানব্বই ভাগ ফৌত হয়ে যায়। বেশিরভাগ মানুষই মারা গিয়েছিল বরফ চাপা পড়ে। চাপা না পড়ে উপায় ছিল না তাদের; কারণ বরফের নীচে প্রতিটি গ্রাম ও নগরী গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, প্রতিটি জলযান ডুবে গিয়েছিল, বিমানের প্রপেলর জ্যাম হয়ে আছড়ে পড়েছিল মাটিতে। আরও বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল চরম শৈত্যে এবং জলকষ্টে।

এইসব তথ্য জমা পড়েছিল সেন্ট্রাল ডাটা ব্যাঙ্কে, সেখান থেকে আমার মস্তিষ্কে। সেখানকার শেষ জীবিত কিছু নারী-বৈজ্ঞানিক মৃত্যুর আগে এইটুকু তথ্য ভবিষ্যতের জন্যে জমা করে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তারপরে পাঁচশো বছরের শূন্যতা। আজ পাঁচশো বছর পরে আবার কিছু তথ্য দিয়ে আপনি জানতে চাইছেন কী ছিল সেই কালো তুষারের রহস্য।

তখন যা পাইনি, আজ আপনি তা দিলেন। এক মৃত সীডারের দেহকোষ দিলেন আমার বিশ্লেষণের জন্য। সেই কোষ বিশ্লেষণ করে যা পেলাম, তার থেকে বুঝতে পারছি, ওই কালো বরফ ছিল একধরনের অতি ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণীর বাহক। তারা অন্য কোনও গ্রহ বা গ্রহাণু থেকে রওনা হয়ে, মহাশূন্য সাঁতরিয়ে ঢুকে পড়েছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে। এককভাবে কিছু ভাবা বা পরিকল্পনা করা তাদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু সমবেতভাবে তারা অনেকগুলো কাজ ঠিকঠাক করে ফেলতে পারে। যেমন অন্য যে কোনও গ্রহকে তারা অধিকার করে নিতে পারে ।

হ্যাঁ, চোখে দেখে বোঝা না গেলেও, আজকের পৃথিবী ওই এককোষী অণুজীবগুলির দখলেই রয়েছে। ওরা আসলে খুব উচ্চশ্রেণির প্যারাসাইট। সেই পাঁচশোবছর আগে থেকেই ওরা অধিকার করে রয়েছে প্রতিটি পুরুষের মস্তিষ্ক এবং জননতন্ত্র। মস্তিষ্ককে অধিকার করে ওরা পুরুষদের করে তুলেছে নির্বোধ। আর জননতন্ত্রকে অধিকার করে ওরা ছড়িয়ে পড়ছে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে; শুধু পুরুষ শিশুদের শরীরে।

এই অবধি শুনেই শারমিন অস্থিরভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, এ তো অবিশ্বাস্য। কেন? কেন ওই অণুজীবরা এরকম করবে? ওদের লাভ কী ?

বার্সো কাগজের ফালিটার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, গড এরপরে ঠিক এই প্রশ্নের উত্তরটাই দিয়েছে। লিখেছে, মানুষের শরীরের ভিতরে ছাড়া ওরা আর কোথাও বাঁচতে পারত না। আবার নরনারী নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের শরীর অধিকার করে নিলে সমস্ত মানুষই হয়ে যেত সীডারদের মতন নির্বোধখ চলমান মৃতদেহ। তখন হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতিটাই অবলুপ্ত হয়ে যেত। তাই ওরা বেছে বেছে শুধু পুরুষদের শরীর অধিকার করে নিল। এখনও সেইভাবেই রয়েছে ওরা।

এই অবধিই লেখা ছিল কাগজের ফালিটায়।

—শারমিন আর বার্সো অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর শারমিন বলল, বুঝতে পারছি, মায়ের গর্ভে পুরুষের ভ্রূণ তৈরি হওয়ার সময়েই ওরা সেই ভ্রূণকে অধিকার করে। কিন্তু প্রথম পুরুষগুলিকে কীভাবে অধিকার করেছিল? তোমার লগবুকেই পড়েছি, পৃথিবীতে কালো তুষারপাত ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি সমস্ত পুরুষ জড় ভরতের মতন আচরণ শুরু করেছিল।

বার্সো বলল, নিশ্চিতভাবেই পানীয় জলের মধ্যে দিয়ে। ওই পনেরোদিনে পৃথিবীর জলের সঙ্গে কালো বরফগলা জল মিশে গিয়েছিল। আর সেই জলে ছিল প্যারাসাইট। তবে কাজ মিটে যাওয়ার পরেই নিশ্চয় জল ছেড়ে ওরা সকলেই পুরুষের শরীরে ফিরে গিয়েছিল। তা না হলে এতদিনে তো পৃথিবীর জল খেয়ে আমারও জোম্বি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

শারমিন বলল, আরেকটা কথা বুঝতে পারছি না। যদি জড়ভরতই হবে, তাহলে ওরা কীভাবে বৃহিকে খুন করল? কীভাবে কুশিকে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিল? তোমাকেই বা ওদের মধ্যে একজন আক্রমণ করতে এল কেমন

করে?

বার্সো একটু অসহিষ্ণু ভাবে বলল, আঃ, শারমিন। ওই প্যারাসাইটরা সীডারদের জড়ভরত বানিয়ে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু ওরা নিজেরা তো জড়ভরত নয়। ওরা তো প্রখর বুদ্ধিমান এবং হিংস্র। আর বুঝতেই পারছ, ওরা শরীরের ভিতরে বসে শরীরকে চালাতে পারে। আমার মধ্যে ওরা সবচেয়ে বড় বিপদকে দেখতে

পেয়েছে, কারণ আমিই একমাত্র জীবিত পুরুষ, যে উন্নত পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞান কিছুটা হলেও নিজের ভিতরে ধরে রেখেছি।

আর...

আর কী?

আর এখনও আমার হাতে রয়েছে এই সুপার কম্পিউটার, যাকে তৈরিই করা হয়েছিল মানুষের মঙ্গলের জন্য। এই কম্পিউটারের চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত যন্ত্র ইতিহাসে নেই। এর ক্ষমতাও অসামান্য। সবচেয়ে বড় কথা কী জানো? একে ধ্বংস করাও প্রায় অসম্ভব, কারণ, এই গড়ের অস্তিত্ব শুধুমাত্র কিছু সার্কিট, চীপস কিংবা ডায়াগ্রামের মধ্যে আবদ্ধ নয়। এর অস্তিত্ব ছড়িয়ে রয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণায়। একবার যখন আমি এর সাহায্য চেয়েছি, একবার যখন চেয়েছি অন্য গ্রহের অণুজীবদের হাত থেকে মুক্তি, তখন সেই কাজ শেষ না করে এ থামবে না।

শারমিনের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ও একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে; মুক্তির স্বপ্ন। বার্সোর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে শক্ত করে ধরে বলল, সেটা কেমন করে সম্ভব বার্সো?

বার্সো বলল, চলো, সেটা গড়কেই জিজ্ঞেস করি। তারপর কীবোর্ডে টাইপ করল, এই অণুজীবদের হাত থেকে মুক্তির পথ কী, গড়?

মুহূর্তের মধ্যে উত্তর এল, আই অ্যাম স্প্রেডিং, আই অ্যাম স্প্রেডিং-আউট ফাস্ট টু অ্যানাইহিলেট দেম। অর্থাৎ ওদের নিকেশ করার জন্যে আমি বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ছি।

তারপরেই সুপার কম্পিউটারের স্লট থেকে এক অদ্ভুত অনুরোধ বেরিয়ে এল। কিছুটা রক্ত দাও বার্সো।

একটা উজ্জ্বল ধাতব ছুঁচ বেরিয়ে এল দেয়ালের গা থেকে। বার্সো তার তর্জনীর ডগাটা সেই ছুঁচের ডগায় ঠেকানো মাত্রই একটা স্বচ্ছ টিউব কিছুটা রক্ত টেনে নিয়ে দেয়ালের ভিতরে কোনও গোপন ল্যাবরেটরিতে সেই রক্তটুকু পাঠিয়ে দিল ।

ইতোমধ্যে বাইরে ভোর হয়ে আসছিল। বার্সো এতক্ষণ বাদে কনসোলের সামনে চেয়ারটা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর ক্রজারের বিশাল কেবিনের অন্য এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ান মাত্র দেয়ালের গা থেকে একটা আরামদায়ক খাট বেরিয়ে এল। নরম গদির ওপরে টান টান হয়ে শুয়ে বাসো চোখ বুজল। কিন্তু ঘুম এল না।

তার বন্ধ চোখের সামনে শারমিনের শরীরটা ভেসে উঠল... যে-শরীর সে আগের দিন রাত্রে সীড-ফার্মের ঘরে দেখেছিল। হ্রস্ব এবং স্বচ্ছ পোশাকে ঢাকা এক মধ্যত্রিশের নারীশরীর। পরিশ্রমে নির্মেদ, মেধায় উজ্জ্বল এবং ব্যবহারে বাস্তববাদী এক নারীর দীঘল দেহ।

মনের আশ্চর্য গতি; এতদিনের তুমুল উদ্বেগের মধ্যে যে-মন বিচলিত হয়নি, আজ সুপার-কম্পিউটারের প্রতিশ্রুতির নিশ্চয়তা পাওয়া মাত্রই সেই একই মন ভীষণভাবে চাইল ওই শরীরকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে। বার্সো চোখ মেলে শারমিনের দিকে তাকাল এবং তাকিয়েই চমকে উঠল। ও দেখল, শারমিন ইতিমধ্যেই ওর দিকে দু-পা এগিয়ে এসেছে এবং ওর দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কামনার ঘোর।

শারমিন ফিসফিস করে বলল, আচ্ছা স্বার্থপর তো তুমি। নিজে শুয়ে পড়লে। আমিও যে তোমার সঙ্গে রাতের পর রাত জাগছি, সে কথাটা একবারও মনে পড়ল না?

বার্সো কোনো কথা না বলে দীর্ঘ দুই বাহু শারমিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল। শারমিন একটা পাখির মতন উড়ে এসে সেই বাহুঘেরে ধরা দিল।

১০

শারমিনের রতিঘুম যখন ভাঙল তখন হিসেব মতন দুপুর, যদিও পোর্টহোলের পর্দা পেরিয়ে আলো ঢুকছিল না। বুকের ওপর থেকে বার্সোর হাতটা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই বার্সোরও ঘুম ভেঙে গেল এবং ওরা দুজনেই একইসঙ্গে প্রায় লাফ দিয়ে গিয়ে ক্রজারের পোর্টহোলের গোল কাচের জানলাটার গায়ে

মুখ ঠেকালো। আসলে ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওরা বুঝতে পারছিল, এইভাবে দুজনে একসাথে ঘুমিয়ে পড়াটা উচিত হয়নি। বিপদ আসতে পারত দুই দিক থেকে।

এক তো অণুজীবদের প্ররোচনায় সীডাররা আক্রমণ করতে পারত ওদের । যদিও বার্সো আশ্বাস দিয়েছিল, ক্রজারের চারিদিকে যে সুরক্ষা বলয় রয়েছে তা ভেদ করা কারুর পক্ষেই অসাধ্য, তবু যেভাবে ক্রুজারটা আছড়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে সেই সুরক্ষাবলয়ে যে কোনও ফাঁকফোঁকর গজিয়ে ওঠেনি সে-কথা তো আর নিশ্চিত করে বলা যায় না।

আর দ্বিতীয়ত, গ্রামের মেয়েরাও ওদের খোঁজে এখানে চলে আসতে পারত। একজন প্রাইজ সীডারকে নিজের ঘর অবধি নিয়ে যাওয়াটা ইলিয়ানা গ্রামের কো-অপারেটিভ অনুমোদন করতে পারে। কিন্তু তাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা তো করবে না।

ক্রুজারটা পাথরের তিন দেয়ালের মধ্যে এমনভাবেই আটকেছিল যে, সামনের দিক ছাড়া সেটার কাছে আসবার আর কোনও উপায় ছিল না। এবং ওই সামনের দিকে এমন কোনও বাধা ছিল না যাতে দৃষ্টি প্রতিহত হয়। চোখ মেললেই টিলার ঢাল বেয়ে একেবারে নীচের উপত্যকা, তার নিকটবর্তী প্রান্তে ইলিয়ানা গ্রাম আর দূরবর্তী প্রান্তে ধীরগামিনী নদী ; সবই পরিষ্কার দেখা যায় ।

দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু সেই-মুহূর্তে বার্সো কিংবা শারমিন কেউই কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। তার কারণ, অদ্ভুত এক কালো কুয়াশায় আদিগন্ত সমস্ত নিসর্গ ঢাকা পড়েছিল। গ্রাম কিংবা নদী তো দূরের কথা, ওরা পোর্ট-হোলের বাইরে দু-হাত দূরের গাছপালাগুলো অবধি দেখতে পাচ্ছিল না।

না ।

অন্যদিন এখানে কত পাখি ডাকে। আজ একটা পোকা অবধি ডাকছিল

এইজন্যেই কি ওদের খোঁজে কেউ আসেনি ; এই কুয়াশার জন্যে? বার্সো আর শারমিন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বার্সো গডের কনসোলের দিকে দু-পা এগোতেই উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল ক্রুজারের অভ্যন্তর এবং আগের রাতের মতোই কনসোলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল অসংখ্য জটিল যন্ত্রপাতি। তবে আপাতত বার্সোর লক্ষ ছিল শুধু কী-বোর্ডটার ওপরে। প্রায় হুমড়ি খেয়ে সে টাইপ করল হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আউটসাইড?

মুহূর্তের মধ্যে কররররর আওয়াজ করে উত্তর লেখা কাগজ বেরোতে শুরু করল। যদিও নিতান্তই অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে লেখা, তবু সারমিন এবং বার্সো দুজনেই তার মধ্যে পরিষ্কার আত্মতৃপ্তির হাসি শুনতে পাচ্ছিল। গড উত্তর দিল, দে আর রানিং ফর ডিয়ার লাইফ। প্যারাসাইটগুলো প্রাণ হাতে নিয়ে পালাচ্ছে। পৃথিবীতে থাকলে এই কাজটা অনেক আগেই করতে পারতাম। পৃথিবীতে থাকলে এবং একজন আক্রান্ত সীডারের দেহকোষ পেলে। কাল সেটা পাওয়ার পরে আর দেরি করিনি।

ও হ্যাঁ, অণুজীবের অ্যান্টিডোট বানাতে গেলে একজন সুস্থ মানুষের রক্তও লাগত। কাল রাত অবধি পুরো মহাবিশ্বে সেরকম একজন মানুষই ছিল। তুমি ।

উত্তরের শেষ অংশটুকু দেখেই আশায় ওদের দুজনেরই বুক দুরদুর করে উঠল।

বার্সো কী-বোর্ডের ওপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে টাইপ করল, ‘কাল রাত অবধি বলছ কেন ?

গড বোল্ড-লেটারে টাইপ করল, আজ সংখ্যাটা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আশা করছি, রাতের মধ্যে পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষ প্যারাসাইট মুক্ত হয়ে যাবে। হয় অণুজীবগুলো পালাবে আর না হলে বাতাসে যে অ্যান্টিডোট ছড়িয়ে দিয়েছি, তার প্রভাবে মরবে।

শারমিন বলল, ওকে জিজ্ঞেস করো, বাইরের ওই কালো কুয়াশা কী…

শারমিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই বার্সো লিখতে শুরু করেছিল এবং লেখা শেষ হওয়ামাত্রই আবার প্রিন্টারের কররর শব্দ। যেন সুপার-কম্পিউটার প্রস্তুত ছিল এই প্রশ্নের জন্যে। জবাব এল, কুয়াশা নয়, মেঘ। পৃথিবীর যাবতীয় জল থেকে ওরা মেঘ তৈরি করছে। কেমন করে করছে, জানি না। তবে কালো রংটাই বলে

দিচ্ছে, মেঘের ভিতরে থিকথিক করছে প্যারাসাইট। আশা করছি সন্ধের মধ্যে এই মেঘের চাদর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছেড়ে রওনা দেবে মহাশূন্যে। আক্রমণ করার জন্যে ওরা আবার খুঁজে নেবে নতুন কোনও গ্রহের নতুন কোনও প্রাণীশরীর। যেভাবে পুরনো মৌচাক পরিত্যাগ করে একদিন সমস্ত মৌমাছি উড়ে যায় অন্য কোনও বনের দিকে, নতুন মৌচাক

বানাবে বলে।

চলো, যাই। বাইরেটা দেখে আসি। বলল শারমিন।

চলো, উত্তর দিল বার্সো।

তারপর ওরা দুজনে টিলার ঢাল বেয়ে নেমে এল ইলিয়ানা গ্রামে। সেখানে তখন আশ্চর্য এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। সারা গ্রামে যে কটি পুরুষ ছিল, সে সীডারই হোক কিংবা শ্রমিক, তার সকলেই কেমন যেন বিহ্বল পায়ে গ্রামের রাস্তা ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। একটু দূর থেকে ভিড় করে তাদের দেখছিল গ্রামের মেয়েরা।

শারমিন আর বার্সোকে তখনো ওরা দেখতে পায়নি, কারণ সেই কালো মেঘের আবরণ তখনও পুরোপুরি সরে যায়নি। তবে আশ্চর্য এক বাতাস বইতে শুরু করেছিল... ঝোড়ো বাতাস, যা বছরের এই সময়ে খুবই অস্বাভাবিক। এবং সেই বাতাসের পিঠে চেপে উঁচুতে.... আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল মেঘের দল।

শারমিন আর বার্সো দেখছিল, ঘুরতে-ফিরতে সেই পুরুষেরা মাঝেমাঝেই মেয়েদের কাছে ফিরে আসছে। মুখে শিশুদের মতন শব্দ করেই আঙুল তুলে দেখাচ্ছে এটা-ওটা। ইশারায় বোঝাচ্ছে নিজেদের আনন্দ, উত্তেজনা। আর কখনো কখনো ইশারায় মেয়েদের কাছে খাবার চাইছে।

বার্সো ফিসফিস করে বলল, অবোধ জন্তুর স্তর থেকে ওরা এখন অনেকটা উঠে এসেছে শারমিন। ওদের চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি সবই স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মতন; মানে, ধরো আমার মতনই। শুধু ওদের কাছে এই জগৎ সম্বন্ধে কোনও তথ্য নেই। সবচেয়ে বড় কথা, সেই তথ্য যে জানাবে, তার মতন ভাষাও ওদের জানা নেই। আগামীদিনে সবটাই তোমাদের শেখাতে হবে।

আমাদের মানে? শারমিন বার্সোর মুখের দিকে তাকালো।

তোমাদের মানে এই পৃথিবীর নারীদের। বিশেষত ইনস্টিটিউটের কর্মীদের। আর তুমি কী করবে? তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে না? তোমার কাছেই তো প্রাক্ তুষারযুগের সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার রয়ে গেছে। সেগুলো ধীরে-ধীরে তুলে দেবে না আমাদের হাতে?

বার্সো নিজের হাতের মুঠিতে শারমিনের হাতটা জোরে চেপে ধরে বলল, দেব। যতদিন বেঁচে থাকব সেই কাজটাই করে যাব। চাকাটাকে একবার গড়িয়ে দিলে আশা করি সেটা চলতেই থাকবে। আর থামবে না ।

শারমিন বার্সোর হাতে একটা টান দিয়ে বলল, তাহলে চলো, তোমার সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিই।

কালো মেঘের আবরণ ছিঁড়ে ওরা দুজনে ইলিয়ানা গ্রামের রাস্তায় পা দিল ।

* * *